দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র
ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী
—পৃঃ ২৬

হালাল ব্র্যান্ডের রমরমায়
ভারসাম্য হারাচ্ছে অর্থনীতি
—পৃঃ ১৭

৭৩ বর্ষ, ২১ সংখ্যা।। ১৮ জানুয়ারি ২০২১।। ৪ মাঘ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

পরাধীনতা থেকে ভারতবর্ষের মুক্তিলাভের নায়ক
আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক

ভারতীয় রাজনীতির 'অভিমন্যু'

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ২১ সংখ্যা, ৪ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

১৮ জানুয়ারি - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

লাভ- জেহাদের প্রতি সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা হচ্ছে এ রাজ্যে ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

সুন্দর মৌলিকের চিঠি : করোনা ভ্যাকসিনেও ভোটের থাবা ▯ ৭

অর্থমন্ত্রীর জন্য চারটি সুপারিশ ▯ অরবিন্দ পানাগড়িয়া ▯ ৮

ভারতীয় রাজনীতির অভিমন্যু ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১১

পরাধীনতা থেকে ভারতবর্ষের মুক্তিলাভ আজাদ হিন্দ ফৌজের কারণেই ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ১৩

বহিরাগত তত্ত্ব বুমেরাং, সংকটে মমতা ▯ ধীরেন দেবনাথ ▯ ১৬

হালাল ব্র্যান্ডের রমরমায় ভারসাম্য হারাচ্ছে অর্থনীতি ▯ জীবানন্দ ভট্টাচার্য ▯ ১৭

নেতাজীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কমিউনিস্টরা ▯ পূরবী রায় ▯ ২৩

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ▯ পারুল মণ্ডল সিংহ ▯ ২৭

শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন কল্পতরু, খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারে সনাতনীর স্রোত ▯ বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় ▯ ৩০

পশ্চিম রাঢ়বাঙ্গলার লোকায়ত উৎসব টুসু পরব ▯ অনিল বরণ মণ্ডল ▯ ৩১

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি ▯ কৃষ্ণা গুহ রায় ▯ ৩৩

কৃষক আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের পরিপন্থী ▯ দীপ্তাস্য যশ ▯ ৩৫

আদর্শ কার্যকর্তা ছিলেন মাধব গোবিন্দ বৈদ্য ▯ ড. তিলকরঞ্জন বেরা ▯ ৩৮

গৌড়ীয় নৃত্য ভারতের প্রাচীন নৃত্যধারাগুলির অন্যতম ▯ মহুয়া মুখোপাধ্যায় ▯ ৪৩

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ ▯ ইন্দুমতী কাটদরে ▯ ৪৬

উর্বর কৃষিজমি নষ্ট করে নীল-সাদা কিষান মান্ডি ▯ ড. মানবেন্দ্র রায় ▯ ৪৮

ইমরানের মুখোশ খুলে দিলেন বঙ্গললনা ▯ শুক্লা শিকদার ▯ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ রঙ্গম : ৩৯ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ চিত্রকথা : ৪২ ▯ শব্দরূপ : ৫০

প্রকাশিত হবে ২৫ জানুয়ারি ২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৫ জানুয়ারি ২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক সংকট

ভারতের সংবিধান প্রণেতারা চেয়েছিলেন দেশে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু সংবিধান গ্রহণের পর সত্তর বছর কেটে গেলেও এখনও তা সম্ভব হয়নি। এর জন্য দায়ী স্বাধীনোত্তরকালে কংগ্রেস এবং বাম দলগুলির ভোটসর্বস্ব রাজনীতি। আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে, এই রাজ্যটিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় হয়েছে। বামফ্রন্টের ৩৪ বছর এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ বছরের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একরকম ভেঙে পড়েছে বলা যেতে পারে। ফলে তৈরি হয়েছে সংকট। তাই স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক সংকট। এটি সাধারণতন্ত্র দিবস বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে।

লিখবেন সুজিত রায়, বিমল শংকর নন্দ প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নেতাজীর পথই ভারতের উত্তরণের পথ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উত্থান এক তোজোদ্দীপ্ত ইতিহাস, প্রবল প্রাণপ্রবাহের ইতিহাস, দুর্বার শক্তিসাধনার ইতিহাস। তিনি মাতৃভূমির মুক্তিসাধনার জ্বলন্ত প্রতীক, আপোশহীন সংগ্রামের মহানায়ক। দেশের পরাধীনতা তাঁহাকে যে মর্মে মর্মে দহন করিতেছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে প্রদত্ত বক্তৃতায়। তিনি সেইদিন বলিয়াছিলেন, 'পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ধনে-প্রাণে মারিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের ব্যবসায় বাণিজ্য ধর্ম-কর্ম-শিল্পকলা মরিতে বসিয়াছে। তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে মৃতসঞ্জীবনীসুধা ঢালিতে হইবে। আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আসুন, মায়ের মন্দিরে যাইয়া সকলে দীক্ষিত হই। একবাক্যে আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, দেশসেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে— দেশমাতৃকার চরণে আমাদের সর্বস্ব বলি দিব এবং মরণের ভিতর দিয়া অমৃত লাভ করিব। তাহা যদি আমরা করিতে পারি তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লইতে পারিবে।' সেইদিনই দেশবাসী তাঁহার নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল, তাঁহার এই উত্থান সেইদিনের শিকড়হীন নেতৃবৃন্দ সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার ক্ষাত্রোচিত মানসিকতা ও কাজকর্মের মূল্যায়ন করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। ফলে পদে পদে তাঁহাকে লাঞ্ছনা ও হেনস্থার শিকার হইতে হইয়াছে।

দেশের মধ্য হইতে কোনোরূপ সহযোগিতার আশা না দেখিয়া তিনি গোপনে দেশত্যাগ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সেনাবাহিনী সংগঠিত করিয়া সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ও দেশীয় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে নানাবিধ কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। তথাপি তিনি মাতৃভূমির প্রতি দায়বদ্ধতার কথা ভুলিয়া যান নাই। কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশ খণ্ডিতকরণের পথে যাইতেছে, কমিউনিস্টরা তাহাতে পোঁ ধরিয়াছে জানিয়া তিনি ভারতীয় নেতৃত্বের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন — মাই ডিভাইন মাদারল্যান্ড নট বি কাট আপ। শুধু তাহাই নহে, স্বাধীনতার পর দেশ গঠনের কার্য কীরূপ হইবে তাহাও তিনি টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন— 'ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে সবচাইতে বড়ো কাজ হইবে প্রতিরক্ষা সংগঠন, যাহাতে ভবিষ্যতে আমাদের অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। আত্মরক্ষার চাহিদা মিটিলে পরবর্তী জরুরি কাজ হইবে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার সমাধান। স্বাধীন ভারতের তৃতীয় কাজটি হইবে শিক্ষা বিস্তার।'

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামেই ভারতের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। তাঁহার জীবন ও কর্ম দেশপ্রেম ও নিঃস্বার্থ আত্মদানের এক অপূর্ব উজ্জ্বল অধ্যায়। দেশের স্বাধীনতার পর তাঁহার স্বপ্নকে যেমন সাকার করিবার চেষ্টা করা হয় নাই, তেমনই তাঁহাকে যোগ্য সম্মানও প্রদান করা হয় নাই। সুখের বিষয় যে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁহাকে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাঁহার প্রতি এতকালের অন্যায়ের কিছুটা হইলেও প্রতিকার করিয়াছেন। নেতাজীর কর্মধারা দেশ ও বিদেশের কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে এক নূতন জীবনবোধ। এই বোধ রূপায়ণের গুরুদায়িত্ব ভারতের রহিয়াছে। স্বাধীনতার সত্তর বৎসর পর নেতাজী নির্দেশিত পথেই ভারত চলিতে শুরু করিয়াছে। এই পথই ভারতের সংকট মুক্তি এবং সবাইকে সঙ্গে লইয়া, সবার বিকাশ ও সবার বিশ্বাসের লক্ষ্যে উত্তরণের পথ।

সুভাষিতম্

অস্থিরং জীবিতং লোকে অস্থিরং ধনযৌবনং।

অস্থিরং পুত্রদারাভিঃ ধর্মকীর্তিযশো স্থিরম্।।

এই জগতে জীবন সদা অস্থির। ধন,যৌবন, স্ত্রী-পুত্রাদিও অস্থির। কেবলমাত্র ধর্ম, কীর্তি ও যশ চিরস্থায়ী।

লাভ-জেহাদের প্রতি সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা হচ্ছে এ রাজ্যে

বিশ্বামিত্র

গত ১১ ডিসেম্বর সাতসকালে প্রাত্যহিক খবরের কাগজ খুলে জনগণ দেখলেন হুলুস্থুলু কাণ্ড। কী হয়েছে? এক দম্পত্তি হোটেলের ঘর ভাড়া দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু মুসলমান যুবকের, হিন্দু বউ দেখে হোটেলের মালিক ঘর ভাড়া দেননি। এই ঘটনার কিন্তু কোনও প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদাতা নেই। এখানে জেনে রাখা ভালো, ১০ জানুয়ারি তৌসিফ হকের একটি ফেসবুক পোস্টের সূত্র ধরে এই খবর ছড়ায়। তৌসিফ ফেসবুকে নিজের দেওয়ালে লিখেছিলেন, তিনি ও তাঁর স্ত্রী জয়ন্তী বিশ্বাস সেইদিন হুগলীতে পিকনিক করতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর কথামতো তিনি বাড়ি ফেরার কোনও চেষ্টা না করে অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে জনৈক 'সুলেখা' লজে যান। লজের কর্তৃপক্ষ তাঁদের ঘড় ভাড়া দিতে অস্বীকার করেন। তাঁরা নাকি বলেন স্বামীর পদবি 'হক' হলে, স্ত্রীর পদবি 'বিশ্বাস' হয় কী করে। ভারত সরকার প্রদত্ত স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্টে তাঁদের বিয়ের শংসাপত্র লজ কর্তৃপক্ষকে তৌসিফ দেখালেও নাকি তাঁরা মানতে চাননি। চল্লিশ মিনিট রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার পর চুঁচুড়ায় এসে 'কিছু একটা ব্যবস্থা' করতে তিনি পারেন বলে তৌসিফের দাবি। শুধুমাত্র এই ফেসবুক পোস্টের সূত্র ধরেই পরের দিন এ রাজ্যের দৈনিকগুলির পাতায় পাতায় এই খবর ছাপা হয়ে যায়--- সেকুলারিজম খতরে মে হ্যায়।

তাদের মধ্যে একটি তো আরও এককাঠি ওপরে। তৌসিফ তার ফেসবুক-পোস্টে কোথাও লাভ-জেহাদের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু দৈনিকটি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 'লাভ-জেহাদের অজুহাতে' ঘর ভাড়া না দেওয়ার অভিযোগ আনে। প্রসঙ্গত, লাভ-জেহাদের চক্রান্ত প্রথম কেরলে শুরু হয়। ওই রাজ্যে হিন্দু মেয়েদের ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে মুসলমান যুবকরা তাদের জেহাদের কাজে ব্যবহার করছিল। কেরলের কমিউনিস্ট সরকার সব জেনে-বুঝেও ছিল নির্বিকার। হিন্দুত্ববাদী দলগুলির লাগাতার আন্দোলনের ফলে এই ব্যাপারটি জনসমক্ষে আসে এবং লাভ-জেহাদ বন্ধে কেরলে হিন্দু- অভিভাবকরাও যথেষ্ট সচেতন হন। দৈনিকটি এই প্রসঙ্গে কেমন চমৎকার ভাবে একনজরে লাভ-জেহাদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে সহানুভূতি-সম্পন্ন করে তুললো। এই রাজেও লাভ-জেহাদ ছিল ভিন্নরূপে। আসলে লাভ-জেহাদের সাধারণ তত্ত্ব হলো হিন্দু মেয়েদের ফোসলাও, এরাজ্যেও হিন্দু মেয়েদের মুসলমান পাত্রের সঙ্গে প্রেম করা বা বিয়ে হওয়াটাকে সেকুলারিজমের আঙ্গিকে এতকাল মহৎ বলে প্রতিপন্ন হয়ে এসেছে, কারণ সেক্ষেত্রে হিন্দু মেয়েটিকে ধর্মান্তরিত হতে হয় এবং তার সন্তানরাও মুসলমান বলেই গণ্য হয়। এর অন্যথা হলে যে, বদলি সরকার টলে যাওয়ারও যে সম্ভাবনা থাকে, পশ্চিমবঙ্গবাসী তা দেখেছিল ২০০৭-এ, প্রিয়াঙ্কা টোডি-রিজওয়ানুর রহমানের ঘটনায়। পক্ষান্তরে হিন্দু ছেলেকে মুসলমান মেয়ে বিয়ে করতে চাইলে সেই মেয়েটির কপালে কী পরিমাণ সামাজিক নির্যাতন অপেক্ষা করছে তা বলাই বাহুল্য। কারণ এক্ষেত্রে মেয়েটিকে আইনত হিন্দু হতে হয়, মুসলমান তো বটেই, হিন্দুফোবিক সেকুলারবদীদের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব। সুতরাং এক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের অধিকারের দোহাই দিয়ে সাতখুন মাপ। এতকালের এই ধ্যানধারণাটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ছে বলেই 'হিন্দুসমাজের মধ্যে চোরা মুসলমান-বিদ্বেষ', 'সংখ্যালঘুর অধিকার-রক্ষা সংখ্যাগুরুর পবিত্র কর্তব্য' ইত্যাদি ন্যারেটিভ সেকুলারিজমের বড়ি গিলিয়ে আবিষ্কার হচ্ছে।

আপাতত, ওই ফেসবুক-পোস্টের পরিপ্রেক্ষিতে দু-একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে জাগছে, যেগুলো না করলেই নয়। প্রথমত, আপনি যদি পিকনিকে বা কোথাও বেড়াতে যান তাহলে ম্যারেজ সার্টিফিকেট সঙ্গে নিয়ে যান? সচিত্র পরিচয় পত্র হিসেবে তো আধারকার্ডই যথেষ্ট! দ্বিতীয়ত, যার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ছেন আচমকা এই কোভিড পরিস্থিতিতে তো তেমন মনে হলে স্থানীয় ডাক্তারখানা বা হাসপাতাল, নচেৎ সটান বাড়ি ফের উচিত। যদি ধরেই নিই তাঁর স্ত্রীর বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল, তাহলে একটা লজ তো নয়, আরও বিশ্রামস্থল খুঁজে দেখার চেষ্টা করাটাই স্বাভাবিক ছিল না কি? তা না করে 'চল্লিশ' মিনিট ধরে রাস্তায় তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে গেলেন কেন? নাকি এসব কিছুই নয়, আসলে 'রাজনীতি' করাটাই তার লক্ষ্য ছিল? তাঁর ফেসবুক-পোস্টের শেষ লাইন 'এ নিয়ে আমার খেদ নেই, পরিস্থিতি কোথায় গেছে সেটাতেই অবাক হচ্ছি'-এতে কিন্তু যথেষ্ট রাজনীতির গন্ধ আছে।

এবার তৌসিফের পরিচয়টা দিয়ে দেওয়া যাক। তিনি চিত্রশিল্পী এবং কিছুদিন আগে তাঁর ফেসবুকে আঁকা বিকৃত শিবের চিত্র হিন্দু-ফোবিকদের কাছে যথেষ্ট প্রশংসিত এবং হিন্দুদের কাছে সমালোচিত হয়। আপাতত তৌসিফের উদ্দেশ্য সফল। তাঁর ফেসবুক-পোস্ট ১০ তারিখে সোশ্যাল মিডিয়ায় যতটা না আলোড়ন তুলতে পেরেছিল, তার কয়েকগুণ পেরেছে পরেরদিন, প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশের দরুন তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরালও হয়েছে অনেক দ্রুতগতিতে। কিছুদিন আগেও 'সেকুলারিজম খতরে মে হ্যায়' ধ্বনি তোলার একটা চেষ্টা হয়েছিল, সল্টলেকে জনৈক কংগ্রেস-ব্যবসায়ীর হোটেলে মুসলমানদের থাকতে না দেওয়াকে কেন্দ্র করে। আসলে সন্ত্রাসের সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই, কমিউনিস্টদের এই থ্রেডে আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই ভরসা রাখতে পারছেন না। সত্যটা স্বীকার করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ■

করোনা ভ্যাকসিনেও ভোটের থাবা

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

দীর্ঘ এক বিরতির পরে আবার আপনাদের মুখোমুখি। চিঠি লিখলেও পাঠাতে পারিনি। চিঠি লেখার অভ্যাসটাও অনেকটা কেড়ে নিয়েছিল মহামারী করোনা। ২০২০ সালের সেই চরম অসহায়তার দিন পার করে ২০২১ সালের আপনাদের সঙ্গে আবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ শুরুর করার সময় একটা বিষয়ে আশ্বস্ত হওয়া গিয়েছে, করোনাকে আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এসে গিয়েছে ভ্যাকসিন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে রিভিউ মিটিংয়ের পর কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে, মকর সংক্রান্তি কাটলেই ১৬ জানুয়ারি থেকে দেশে কোভিডের টিকাকরণ শুরু হয়ে যাবে। প্রথমে দেশের মোট ৩ কোটি ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যকর্মীকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেবে কেন্দ্রের সরকার। তারপর আরও ২৭ কোটিকে। সকলকেই বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রের এই উদ্যোগের ফায়দা নিতে তৎপর রাজ্যের তৃণমূল সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চিঠি প্রকাশ করে পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্দেশে লিখেছেন, 'আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের সরকার রাজের সমস্ত মানুষের কাছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে।'

কিন্তু সত্যই কি তাই? আসুন বাস্তবটা জেনে নেওয়া যাক :

● শুরুতেই মনে রাখা দরকার, সেরাম ইনস্টিটিউটের তৈরি 'কোভিশিল্ড' ভ্যাকসিন এবং ভারত বায়োটেকের তৈরি 'কোভ্যাকসিন', ভারতে যা উৎপাদিত হয়েছে তার পুরো স্টক এখন কেন্দ্রের সরকারের কাছেই রয়েছে। কোনও রাজ্য সরকারের কাছে নেই।

● কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক যা ঠিক করেছে তাতে প্রথম সারির স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যার নিরিখে কেন্দ্রই বিনামূল্যে রাজ্যগুলিকে সেই সংখ্যক ভ্যাকসিন পাঠাবে।

● যা ঠিক হয়েছে তাতে রাজ্যের কাজ শুধু সেই টিকা স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং টিকাকরণে সাহায্য করা। টিকা বাবদ কিন্তু রাজ্যের কোনও খরচ নেই। প্রথম দফায় ৩ কোটি স্বাস্থ্য কর্মীর টিকা বাবদ খরচ কেন্দ্রই বহন করছে। তবে

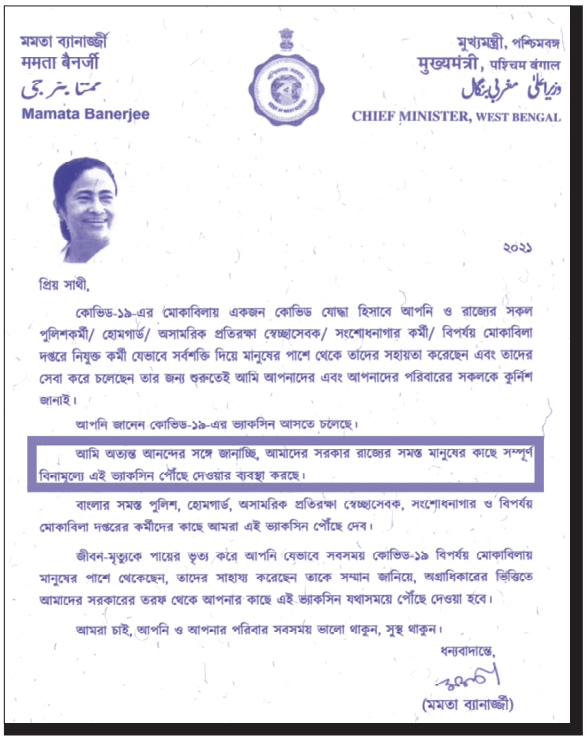

মমতা ব্যানার্জী
ममता बैनर्जी
ممتا بنرجی
Mamata Banerjee

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
وزیراعلیٰ مغربی بنگال
CHIEF MINISTER, WEST BENGAL

২০২১

প্রিয় সাথী,

কোভিড-১৯-এর মোকাবিলায় একজন কোভিড যোদ্ধা হিসাবে আপনি ও রাজ্যের সকল পুলিশকর্মী/ হোমগার্ড/ অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবক/ সংশোধনাগার কর্মী/ বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরে নিযুক্ত কর্মী যেভাবে সর্বশক্তি দিয়ে মানুষের পাশে থেকে তাঁদের সহায়তা করেছেন এবং তাদের সেবা করে চলেছেন তার জন্য শুরুতেই আমি আপনাদের এবং আপনাদের পরিবারের সকলকে কুর্নিশ জানাই।

আপনি জানেন কোভিড-১৯-এর ভ্যাকসিন আসতে চলেছে।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের সরকার রাজ্যের সমস্ত মানুষের কাছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে।

বাংলার সমস্ত পুলিশ, হোমগার্ড, অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবক, সংশোধনাগার ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীদের কাছে আমরা এই ভ্যাকসিন পৌঁছে দেব।

জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে আপনি যেভাবে সবসময় কোভিড-১৯ বিপর্যয় মোকাবিলায় মানুষের পাশে থেকেছেন, তাদের সাহায্য করেছেন তাকে সম্মান জানিয়ে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের সরকারের তরফ থেকে আপনার কাছে এই ভ্যাকসিন যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়া হবে।

আমরা চাই, আপনি ও আপনার পরিবার সবসময় ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

ধন্যবাদান্তে,

(মমতা ব্যানার্জী)

হ্যাঁ, পরিবহণ বাবদ সামান্য খরচ হতে পারে রাজ্য সরকারের।

● দ্বিতীয় দফায় যে ২৭ কোটি নাগরিককে টিকা দেওয়া হবে, তারও পুরো খরচই দেবে কেন্দ্র। ৫০ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে প্রবীণ নাগরিকদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা দেওয়া হবে। যাঁদের কোমর্বিডিটি রয়েছে তাঁদের আগে টিকা দেওয়া হবে।

● মুখ্যমন্ত্রীর চিঠিতে বলা হয়েছে, তৃণমূল সরকার বিনামূল্যে মানুষের কাছে ভ্যাকসিন 'পৌঁছে' দেবে। কিন্তু সেখানে কোথাও এটা উল্লেখ করা নেই যে, ভ্যাকসিন বাবদ খরচ কে করছে।

করোনা কালে এই রাজ্যে সরকারের কোভিড ব্যবস্থাপনা ছিল ভয়ংকর। চিকিৎসক, পুলিশ সবাই এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করেছিলেন। কোভিডের কেস গোপন করা, কোমর্বিডিটির কারণ দেখিয়ে কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা কম করে দেখানো, লকডাউন কঠোরভাবে বাস্তবায়িত না করা, ভরা সংক্রমণের মধ্যে ফুলের বাজার, মিষ্টির দোকান খুলতে অনুমতি দেওয়া ইত্যাদি নিয়ে বারবার অসন্তোষ জানিয়ে নবান্নকে চিঠি দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরা। এখন, কেন্দ্রীয় সরকার যখন দেশের ৩ কোটি ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারকে বিনামূল্যে কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা বলছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী তার ক্রেডিট নিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

বছরের গোড়ায় এমন চালাকিতে আপনার বোকা বনে যাবেন না আশা রাখি। ■

অর্থমন্ত্রীর জন্য চারটি সুপারিশ

অরবিন্দ পানাগড়িয়া

প্রধানমন্ত্রীর উচিত এক পৃথক 'ডিসইনভেস্টমেন্ট' মন্ত্রালয়ের গঠন করা, এবং দ্রুত বেসরকারিকরণের স্পষ্ট বার্তা দিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে একজন অদম্য দৃঢ়তা ও প্রামাণ্য দক্ষতাযুক্ত বাইরের টেকনোক্রাটকে নিযুক্ত করা দরকার।

এক মাসের কম সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করতে চলেছেন। অর্থমন্ত্রীর কী কী বিষয়সূচি বা অ্যাজেন্ডা হওয়া প্রয়োজন? আমরা আর্থিক সংশোধন প্রস্তাবের দিকে দৃষ্টিপাত করার সঙ্গে দেশে স্বাভাবিক অর্থব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে সরকার যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছেন সেগুলিকে স্বাগত জানাতে চাই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাওড়েকরের ঘোষণা অনুযায়ী সরকার জরুরিকালীন ভিত্তিতে দুটি ভ্যাকসিনের প্রচলন করতে চলেছে, এই সঙ্গে আরও দুটিরও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আমার মতামত এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একটি ভ্যাকসিনকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ এবং যার সাফল্য পঞ্চাশ শতাংশের বেশি প্রমাণিত না হয় সরকার অনুমোদন দিতে বিবেচনা করতে পারে, সেক্ষেত্রে সরকারি সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত হয়ে ভ্যাকসিন সকলের কাছে সুলভ্য করতে পারবে, বিশেষত সেইসকল শহর ও টাউনে যেখানে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব তুলনামূলভাবে সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। ভ্যাকসিন (অর্থনীতির অর্থে সকলের জন্য লভ্য বস্তু বা সেবা) 'পাবলিক গুড'-এর এক জলন্ত উদাহরণ যার জন্য সরকারি কোষাগার থেকে খরচ করা একই রকমভাবে জাতীয় নিরাপত্তার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এই খরচের ব্যাপারে কার্পণ্য করা উচিত নয়, কারণ কোভিড-১৯ অর্থব্যবস্থার ক্রমাবনতির এক উদ্দীপক স্বরূপ, প্রতি মাসে জিডিপি-র ক্ষতির পরিমাণ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। সুতরাং দ্রুত ভ্যাকসিনেশন অতিরিক্ত জিডিপি-র এই ক্ষতি থেকে অনেক বেশি মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য।

এবার ২০২১-২২ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক, আমি অর্থমন্ত্রীর জন্য মাত্র চারটি সুপারিশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছি—

প্রথমত, জনগণের চলাফেরার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার জন্য ভ্যাকসিনেশন, আর্থিক প্রণোদনের প্রত্যাশাকে কার্যকরী চাহিদাতে রূপান্তরিত করা এবং কার্যকরী চাহিদাকে সরবরাহ প্রতিক্রিয়াতে পরিবর্তিত করা এক দুর্দান্ত সম্ভাবনা। সুতরাং এই মুহূর্তে দুইভাবে রাজস্ব বৃদ্ধির দ্বারা অর্থব্যবস্থাকে চাঙ্গা করা বুদ্ধিমানের কাজ হয়ে উঠবে।

(১) পরবর্তী ছ' মাসের মধ্যে সরকারকে দ্রুত বকেয়া করসংক্রান্ত প্রত্যার্পণ মিটিয়ে ফেলা, রাজ্যগুলির জিএসটি-র ধার শোধ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা সরবরাহকৃত বস্তু ও পরিষেবার মূল্য পরিশোধ করার দিকে নজর দেওয়া দরকার।

(২) সরকার যেন ২০২১-২২ সালের বাজেটে অতিরিক্ত ১-২ শতাংশের মতো রাজস্ব ঘাটতি রাখার প্রস্তাবে সম্মত হয়, যেটা মহামারীর অনুপস্থিতিতে ঘটতে পারতো। এই মুহূর্তের অতিরিক্ত ব্যয় ঠিক এতটাই হওয়া উচিত যতখানি সরকার দ্বারা খরচের নিয়ন্ত্রণে মহামারীর প্রথমদিকে করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সরকারকে অতি অবশ্যই পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলিতে একটি বেশ বড়ো পরিমান মূলধনের পুনরায় সংগ্রহ অগ্রিম শুরু করতে হবে। রাজস্ব সংগ্রহ সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে প্রভাবিত হবে, তা সত্ত্বেও সাময়িক বিরামের ফলে কৃত ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধে এবং এককালীন অমূল্য/ব্যয়বহুল পুনর্গঠন অনেক দুর্বল কোম্পানিগুলির টিকে থাকা করোনা পরবর্তীকালে সম্ভব হবে না। ফলস্বরূপ দেউলিয়ার ফলে অনাদায়ী মূলধন সংগ্রহ (এনপিএএস) এবং ক্রেডিট গ্রোথ (আমানত বৃদ্ধি)-এর উপর বিরূপ প্রভাব ঘটবে।

বিশেষত পিএসবিএস-গুলির ওপর যারা পরিশোধের অবকাশ এবং ঋণ পুনর্গঠনের দায়ভার বহন করছে।

বর্তমান সরকারের শাসন কালের প্রথমদিকে ধীর পদক্ষেপ গ্রহণের নীতির ফলে অনাদায়ী মূলধন সংগ্রহের (এনপিএএস) ক্ষেত্রে এরজন্য অর্থব্যবস্থাকে এক বড়ো মূল্য দিতে হয়েছে। আমানত বৃদ্ধি (ক্রেডিট গ্রোথ) পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলিতে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ভেঙে পড়েছিল এবং অতি দ্রুত নন ব্যাঙ্ককিং ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলির ভরপুর অবস্থা, বৃদ্ধির হার ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৬.১ শতাংশে নেমে যাওয়া এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৪.২ শতাংশে চলে যাওয়া— এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেটা এড়াতে হবে বিশেষত যেখানে করোনা ভাইরাসের সংকট ইতিমধ্যে অর্থব্যবস্থাকে দুর্বল করেছে। অবশ্য একটু অদলবদল ঘটিয়ে সরকার পুঁজি সংগ্রহের বিরূপ জট এড়াতে পারে।

তৃতীয়ত, এখন অবশ্য বিপুল সংখ্যক পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারিকরণে বাধাদানের আগেই অজুহাত খাড়া করা যায়। অতিরিক্ত আর্থিক সম্ভাবনার প্রয়োজন তীব্র। একইভাবে ভবিষ্যতের বৃদ্ধি দাবি করে যে উদ্যোগগুলি দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তরে পরিচালিত হবে তাদের সিইও-র নেতৃত্বে অবশ্যই কোনো অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত জন হবেন না।

যে কোনো ভুল সিদ্ধান্তের ভিজিল্যান্স এজন্সি দ্বারা নজরদারির ভয়ে বাণিজ্যিকভাবে এন্টারপ্রাইজ চালানোর অতি অবশ্যই উৎসাহিত হতে দেখা যায়। আশ্চর্যজনক ভাবে, সমস্ত তথ্যপ্রমাণে সমকক্ষ বেসরকারি উদ্যোগগুলির তুলনায় পিএসইউ-গুলির অস্বাভাবিক ফেরত দিতে ইঙ্গিত করে। আমাকে যদি স্পষ্টবাদী হতে অনুমতি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে জানাই, কয়েক দশক ধরে পিএসইউ-গুলি করদাতাদের অর্থ লুঠের উৎস।

এটাও স্বীকৃত সত্য যে মন্ত্রীসভায় বার বার ২০১৬ সাল থেকেই বেসরকারিকরণের পক্ষে সম্মতি দিয়ে আসছে, সুতরাং স্পষ্টতই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় 'বটলনেক (বাধা)'-টি ব্যুরোক্রাটিক স্তরেই রয়েছে। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর এখনই উচিত এক পৃথক 'ডিসইনভেস্টমেন্ট' মন্ত্রালয়ের গঠন করা যার সুফল দেখা গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীজীর আমলে, কিন্তু পরবর্তী ইউপিএ সরকার দ্বারা এই মন্ত্রাণালয় ভেঙে দেওয়া হয়েছে। দ্রুত বেসরকারিকরণের এক স্পষ্ট বার্তা দিতে একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদীজীর উচিত একজন অদম্য দৃঢ়তা ও প্রামাণ্য দক্ষতাযুক্ত বাইরের টেকনোক্রাটকে নিযুক্ত করা যেমন, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সিইও আদিত্য পুরী।

পরিশেষে, বাজেটে সরকারকে পর্যায়ক্রমে শুল্কহ্রাসের একদৃঢ় সিদ্ধান্তের কর্মসূচিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে যে যাতে গড় শুল্ক ২০২৪ সালের মধ্যে ১৪ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে নেমে আসবে। এই কর্মসূচির আওতায় নীতিগত ভাবে সুবিবেচনা করে চূড়ান্ত শুল্ক সঙ্কুচিতকরণে উচিত অটো, অটোপার্টস, খেলনা, টেক্সটাইল ও পোশাকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। বিশাল বিশ্ববাজারের সুযোগ এবং লাভ নেওয়ার এটাই একমাত্র কার্যকরী পথ।

কতকগুলি প্রধান সংস্কার— নতুন শ্রম কোড, নতুন কৃষি আইন, দেউলিয়াপনার কোড, ন্যূনতম কর্পোরেট মুনাফা কর, দেশব্যাপী একক জিএসটি এবং ব্যাপক ডিজিটালাইজেশন ইতিমধ্যে লাগু হয়েছে। এরসঙ্গে আরও যেগুলি যুক্ত হবে বেসরকারীকরণ এবং বাণিজ্য উদারীকরণ যা দ্বিগুণ অঙ্কের বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করবে এবং লক্ষ লক্ষ অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ জনসাধারণের জন্য কোভিড-১৯ পরবর্তী দশকে এনে দেবে। এই সুবর্ণ সুযোগটি ভারত হেলায় হারাতে পারে না।

(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ)

কোভিড-১৯-এর শিক্ষা

বিধান চন্দ্র রায়

(সচিব, খোয়াই জিলা পরিষদ)

কোভিড-১৯-এর করোনা ভাইরাস
বিশ্ববাসীর জন্য এক বাস্তব শিক্ষা।
জাতি, ধর্ম, বর্ণে ভেদাভেদ,
অহংমত্ত মানুষ, প্রকৃতি বিরুদ্ধাচরণে সিদ্ধহস্ত।
পৃথিবীর তাবড় বৃহৎ পুঁজিপতি দেশগুলো,
এক নিমিষের করোনা মোকাবেলায়
ত্রাহি ত্রাহি রব।
স্রষ্টা পুরুষ বিধি, হট্টহাস্য,
জানান দিচ্ছেন রুদ্রমূর্তি ধরে;
বিপন্ন মানুষ আর প্রকৃতির উপরে
অত্যাচার আর কত দিন?
করোনা যাবে চলে একদিন
ততদিনে পৃথিবীর স্বৈরাচারী শক্তিকে
জানিয়ে দিয়ে গেল এক লহমায়
দুর্বলের উপর অন্যায় আর নয়।
বিবেক শক্তির অভ্যুদয় যেন হয়।
প্রকৃতি আর ঐশ্বারিক শক্তির কাছে
অসাধু মানুষের লম্পঝম্প নিতান্ত ম্রিয়মাণ।

Advt.

পরলোকে প্রবীণ স্বয়ংসেবক গোপীবল্লভ পাল

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী জেলার হুগলী-চুঁচুড়া নগরের কাপাসডাঙ্গা শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ও জেলার ধর্ম জাগরণ প্রমুখ গোপীবল্লভ পাল গত ২৮ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। কাপাসডাঙ্গা শাখা যারা শুরু করেছিলেন তাদের মধ্যে তিনি একজন। হুগলী বিভাগের কার্যালয় 'বন্দে মাতরম্' ভবন নির্মাণে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। তাঁর ছোটো ভাই বীরেন পাল হুগলী বিভাগ সঙ্ঘচালক। তাঁর পরিবার সঙ্ঘময়। জরুরি অবস্থা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে তারা দুই ভাই-ই সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন। তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দায়িত্ব পালন করেন। নিউজ পেপার্স হকার্স ইউনিয়ন ও ইডেন গ্যাস ডিস্টিবিউটার এজেন্টদের কাজকর্মের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি স্ত্রী, ১ কন্যা ও ১ পুত্র এবং বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুকে রেখে গেছেন।

আমবাসা গ্রামোন্নয়ন ব্লকের ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১৫টি ভিলেজ কাউন্সিলের মহিলা ও পুরুষদের শৌচালয় নির্মাণ করে নজির গড়েছে।

GOVERNMENT OF TRIPURA
Office of the Block Development Officer
AMBASSA RD BLOCK DHALAI

Sl. No.	FY	Toilets Sanctioned	Scheme	Completed	Remarks
1.	2015-16	111	SBM(G)	111	
2.	2016-17	350	SBM(G)	346	Work is going on
3.	2018-19	1477	SBK	930	Work is going on
4.	2019-20	1104	LOB	1101	Work is going on
5.	2019-20	278	SBM(G)	275	
6.	2020-21	325	SBM(G) Phase-2	Work is going on	1st instalment is provide to all

ভারতীয় রাজনীতির অভিমন্যু

সন্দীপ চক্রবর্তী

একদিকে কৌরবদের সপ্তরথী অন্যদিকে একা অভিমন্যু। এই অসম যুদ্ধে অভিমন্যুর কী পরিণতি হয়েছিল, আমরা মোটামুটি সকলেই জানি। ২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি আর মাত্র কয়েক দিন দূরে। এই সন্ধিক্ষণে এসে মনে হচ্ছে, ২৩ জানুয়ারি দিনটি যার জন্মদিন হিসেবে ভুবনবিখ্যাত সেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়া ভারতীয় রাজনীতির অভিমন্যু হিসেবে আর কাউকে ভাবা যায় না। স্বাধীনতার আগে এবং পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুই ভারতীয় রাজনীতির আদি ও অকৃত্রিম অভিমন্যু। একদিকে গান্ধীজী-সহ কংগ্রেস ও বামপন্থী সপ্তরথী অন্যদিকে তিনি একা। পরিণতিও একইরকম। নেতাজী অপমানিত, ক্লেদাক্ত, রক্তাক্ত কিন্তু শেষ বিচারে নায়ক থেকে মহানায়ক। তারপর সেখান থেকে ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির প্রধান কারিগর।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবাহিত হয়েছিল দুটি ধারায়। একটি ছিল নরমপন্থী অন্যটি চরমপন্থী। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে নরমপন্থী ধারাটির উদ্ভব। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সভাপতি অ্যালেন অক্ট্যাভিয়ান হিউম চেয়েছিলেন কংগ্রেস এমন একটা প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠুক যেখান থেকে ভারতীয়রা আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাদের দাবিদাওয়া পেশ করতে পারবে। না, হিউম কোনওরকম সংঘাতে যেতে চাননি। ব্রিটিশ হিউমের পক্ষে স্বজাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে সংঘাতে যাওয়া সম্ভবও ছিল না। তদানীন্তন ভারতীয় নেতাদের বেশিরভাগই হিউমের এই নরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল ১৮৫৭ সালের মহাসংগ্রাম। এবং এই সংগ্রাম ছিল চরমপন্থী। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক সক্রিয়তা শুরু হলো প্রথম দিকে তা ছিল নরমপন্থী এবং আবেদন-নিবেদন নির্ভর। কংগ্রেসের নরমপন্থী মনোভাব ভারতীয়দের

কেউ কেউ বিশ্বাস করেন তিনি ফিরে আসবেন। ফিরে এসে ঝাঁকুনি দিয়ে বাঙ্গালিকে দাঁড় করাবেন। তারপর জাগাবেন ভারতবর্ষকে। হোক না কষ্টকল্পনা। ক'জন পারেন মৃত্যুর পর এরকম অমৃতভাণ্ডে পরিণত হতে? গান্ধীজী পারেননি, নেহরু পারেননি কিন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পেরেছেন।

মধ্যে কেউ কেউ মানতে পারেননি। বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ এদের অন্যতম। মূলত এদেরই নেতৃত্বে ও অনুপ্রেরণায় শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্য একটি ধারা— যার নাম চরমপন্থী স্বাধীনতা আন্দোলন।

নেতাজীর রাজনৈতিক জীবন কংগ্রেস থেকে শুরু হলেও তিনি কংগ্রেসের চিরাচরিত নরমপন্থী মানসিকতার মানুষ ছিলেন না। ব্রিটিশরাজের শিকড়ে চরম আঘাত হানাই ছিল তার রাজনৈতিক লক্ষ্য। অন্যদিকে সেইসময় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন কংগ্রেসের মূল চালিকাশক্তি। সম্প্রদায়গত পরিচয়ে তিনি বৈষ্ণব এবং বংশানুক্রমিক পেশায় বানিয়া। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যত না তাঁর কাছে রাজনৈতিক আন্দোলন তার থেকে অনেক বেশি আত্মিক উত্তরণের মাধ্যম। হিংসায় তিনি বিশ্বাস করেন না। সুতরাং নেতাজীর সঙ্গে তার সংঘাত যে অনিবার্য হয়ে উঠবে সে কথা বলাই বাহুল্য। যদিও প্রকাশ্যে কেউই পরস্পরের বিরুদ্ধে অসৌজন্য প্রকাশ করেননি। কিন্তু মতপার্থক্য ছিল, সংঘাতও ছিল। চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক ঘটনার অভিঘাতে গান্ধীজী যখন অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন তখন নেতাজী এই সিদ্ধান্তকে বলেছিলেন Historical Blunder। তবে চৌরিচৌরা নয়, গান্ধীজী ও নেতাজীর রাজনৈতিক সংঘাতের কিংবা আরও পরিষ্কার করে বললে নেতাজীর প্রতি গান্ধীজীর অন্যায় আচরণের চরম নিদর্শন আমরা পাই ত্রিপুরি কংগ্রেসের সময়।

১৯৩৯ সালের কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের সময় বিরোধিতার মুখোমুখি হবেন জেনেও নেতাজী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন। কয়েকমাস আগে ইউরোপে দীর্ঘ ছুটি কাটিয়ে গান্ধীজীর মানসপুত্র জওহরলাল নেহরু দেশে ফিরেছেন। গান্ধীজী নেহরুকে অনুরোধ করলেন সুভাষের বিরুদ্ধে মনোনয়নপত্র দাখিল করার জন্য। নেহরু রাজি হলেন না। এরপর প্রস্তাব দেওয়া হলো মৌলনা

ফঃ ২

আজাদকে। তিনিও রাজি হলেন না। শেষমেশ রাজি হলেন অন্ধ্রের নেতা ড. পট্টভি সীতারামাইয়া। নেতাজী নিজের জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। কিন্তু ২৯ জানুয়ারি ১৯৩৯ ফল প্রকাশিত হবার পর দেখা গেল সুভাষ পেয়েছেন ১৫৮০টি ভোট আর সীতারামাইয়া ১৩৭৭টি ভোট। সুভাষ জিতলেন বটে কিন্তু তাঁর জয়ে গান্ধীজী মর্মাহত হলেন। প্রকাশ্যে বললেন, 'আমি ওর (সুভাষের) জয়ে খুশি— কিন্তু মৌলনা আজাদ সাহেব মনোনয়নপত্র দাখিল করতে রাজি না হওয়ায় আমিই যেহেতু পট্টভি সীতারামাইয়াকে প্রার্থী হতে বলেছিলেন, তাই ওর পরাজয় আমারই পরাজয়।'

এরপরের ঘটনা আরও সাংঘাতিক। ১৯৩৯ সালের মার্চে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসেছিল জব্বলপুরের কাছে ত্রিপুরিতে। কিন্তু অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমের ফলে সুভাষ ফেব্রুয়ারি ২০-২১ তারিখ নাগাদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সময়েই ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হবার কথা ছিল। অসুস্থ সুভাষ ওয়ার্ধায় যেতে পারবেন না বলে বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক স্থগিত রাখার অনুরোধ জানিয়ে বল্লভভাই প্যাটেলকে টেলিগ্রাম করেন। অন্য একটি টেলিগ্রামে গান্ধীজীকে তার বিবেচনা অনুযায়ী নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে অনুরোধ করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, গান্ধীজী সুভাষের অনুরোধে কর্ণপাত করেননি। নতুন কমিটিও গঠিত হয়নি, আবার পুরনো কমিটির বৈঠকও স্থগিত রাখা হয়নি।

গান্ধীজীর এহেন উদাসীনতার পিছনে যে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি ছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। কারণ এর কিছুদিনের মধ্যেই জানা গেল, সুভাষের প্রতি কংগ্রেসের নেতা এবং সাধারণ কর্মীরা ক্ষুব্ধ। তাদের অভিযোগ, টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক স্থগিত রাখতে বলার মধ্যে সুভাষের একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব ফুটে উঠেছে। কংগ্রেস তার অনুপস্থিতিতে কোনও কাজ করুক, সেটা নাকি সুভাষ চানই না! প্রতিবাদে বল্লভভাই প্যাটেল-সহ এগারো জন সদস্য কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। বাধ্য হন সুভাষ অধিবেশনে যোগ দিতে। জ্বরে কাবু স্ট্রেচার-বাহিত সুভাষ মঞ্চে ওঠার পর গান্ধী-অনুগামী এক কংগ্রেস নেতা মন্তব্য করেছিলেন, 'Why don't you check whether he has any onions under his armpits।' পরের মাসেই সুভাষ কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন। তারপর এগিয়ে যান তার নিজস্ব পথে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে গান্ধীজী না সুভাষ— কার অবদান বেশি? বাম এবং কংগ্রেসের ল্যাবরেটরিতে তৈরি ভারতের ইতিহাসে সুভাষ দুটি অনুচ্ছেদের বেশি জায়গা পান না। অন্যদিকে গান্ধীজীকে নিয়ে পাতার পর পাতা জুড়ে আলোচনা হয়। একথা অনস্বীকার্য যে, গান্ধীজীর জন্যেই ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গান্ধীজীর জন্যেই কি ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছিল? এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন সামরিক ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ মেজর জেনারেল জি ডি বক্সি। বোস : অ্যান ইন্ডিয়ান সামুরাই গ্রন্থে তিনি ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি এবং পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত রাজ্যপাল পি বি চক্রবর্তীর আলাপচারিতার এক বিবরণ দিয়েছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে ক্লিমেন্ট অ্যাটলি ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং ভারতের হাতে ক্ষমতা প্রত্যার্পণের সনদে তিনিই স্বাক্ষর করেছিলেন। মেজর জেনারেল বক্সি লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত রাজ্যপাল পি সি চক্রবর্তী সরাসরি অ্যাটলিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'গান্ধীজীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের তীব্রতার কারণেই কি আপনারা তড়িঘড়ি ভারতের হাতে ক্ষমতা প্রত্যার্পণ করে এ দেশ থেকে চলে গেলেন?' জবাবে অ্যাটলি তাদের ভারতত্যাগের অনেকগুলি কারণ দেখিয়েছিলেন। তবে তার মধ্যে প্রধান ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং তার আজাদ হিন্দ বাহিনী। বিশেষ করে সুভাষের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর এবং লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দি সৈন্যদের বিচারপর্ব চলার সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছিল। ভারতের ব্রিটিশ সরকার আর একটি সিপাহী মহাসংগ্রামের আশঙ্কা করেছিল। দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভারে পর্যুদস্ত গ্রেট ব্রিটেন এত বড়ো ঝুঁকি নিতে চায়নি। সেই কারণেই ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পি বি চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'গান্ধীজী ও কংগ্রেসের আন্দোলন কি কোনও প্রভাবই ফেলতে পারেনি?' যেন কেউ তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে, ঠিক সেই ভঙ্গিতে হেসে অ্যাটলি বলেছিলেন, 'মি-নি-মা-ল!' অর্থাৎ খুবই সামান্য।

গান্ধীজী সুভাষকে কংগ্রেসের ভেতরেই আগাছায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন। বুঝতে পারেননি সুভাষ একদিন তাকেও ছাড়িয়ে যাবে। বামপন্থীরা গান্ধীগিরির ধার ধারেন না। তারা যদি কাউকে পথের কাটা বলে মনে করেন তা হলে তার ভাবমূর্তি ধ্বংস করার জন্য যে-কোনওরকম অসভ্যতায় নেমে আসতে পারেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া ইংল্যান্ডকে সমর্থন করা মাত্র কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (সিপিআই) ইংল্যান্ডের সমর্থক হয়ে গেল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বারোটা বাজিয়ে ইংল্যান্ডকে সমর্থনের ডাক দিল সিপিআই। স্বভাবতই সুভাষ এর প্রতিবাদ করেছিলেন। ফলে সিপিআই পরিচালিত জনযুদ্ধ পত্রিকায় সুভাষকে সাম্রাজ্যবাদের কুকুর হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল। কারণ সুভাষ ভারতকে স্বাধীন করার জন্য জাপানের সাহায্য নিয়েছিলেন। আর জাপান ছিল রাশিয়ার বিরোধী। জনযুদ্ধে প্রকাশিত পরপর কয়েকটা কার্টুনে সুভাষকে কখনও হিটলারের ছায়াসঙ্গী গোয়েবলসের পাশে বাচ্চা ছেলে হিসেবে, আবার কখনও জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর কুকুর হিসেবে দেখানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাম নেতারা প্রকাশ্য জনসভায় নেতাজীকে তোজোর কুকুর বলতেন। সে যুগের এমনই এক নেতার নাম জ্যোতি বসু। তবুও নেতাজীকে আটকানো যায়নি। তিনি ভারতীয় রাজনীতির অভিমন্যু ঠিকই কিন্তু বিস্মৃত নন। বরং স্বাধীনতার তিয়াত্তর বছর পরে তিনি এক আশ্চর্য বিশল্যকরণীতে পরিণত হয়েছেন। বিশেষ করে অবক্ষয়িত এবং পরাভূত বাঙ্গালির কাছে। এখনও কেউ কেউ বিশ্বাস করেন তিনি ফিরে আসবেন। ফিরে এসে ঝাঁকুনি দিয়ে বাঙ্গালিকে দাঁড় করাবেন। তারপর জাগাবেন ভারতবর্ষকে। হোক না কষ্টকল্পনা। ক'জন পারেন মৃত্যুর পর এরকম অমৃতভাণ্ডে পরিণত হতে? গান্ধীজী পারেননি, নেহরু পারেননি কিন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পেরেছেন। ◻

পরাধীনতা থেকে ভারতবর্ষের মুক্তিলাভ আজাদ হিন্দ ফৌজের কারণেই

'সুভাষচন্দ্রের 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠনের ফলে ইংরেজ বুঝিতে পারিল, প্রধানত যে ভারতীয় সিপাহি সৈন্যের সহায়তায় তাহারা ভারতবর্ষ জয় ও এতদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, অতঃপর তাহাদের উপর আর নির্ভর করা যায় না। সুতরাং ইংরেজ শ্রমিকদল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াই ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল।'

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বাধিনায়ক তথা 'স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী' নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ছিলেন এক বিরল দেশপ্রেমের অধিকারী। দেশবাসীর অন্তরে স্বরাজ-সাধনায় তখন নানান ধারা সংরক্ষিত হচ্ছিল। বাস্তবতার মাটিতে সেই সব ধারাকে একযোগে দাঁড় করালেন তিনি। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র ও অরবিন্দের চেতনায় স্বরাজের ভিন্নতর ধারা প্রবাহিত ছিল। যাবতীয় ধারাকে সমন্বয় করে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনার কৃতিত্ব সুভাষের। স্বরাজ্য ভাবনায় তাই তিনি মহারথী। ভারতমাতার পূজায় তিনি নানান মনীষীর ফুল একত্রে গেঁথে মালা রচনা করেছিলেন।

বঙ্কিম-মানসে ছিল অখণ্ড-জাতির ভাবনা, অসুর বিনাশের যজ্ঞ; অর্থাৎ সাহিত্য-স্বরাজ। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে প্রবাহিত হতো ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক স্বরাজ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার মধ্যে মুক্তি পেল ভারতবর্ষের অখণ্ড চেতনার রূপ-রস-গন্ধ। শ্রী অরবিন্দ ঘোষ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের বীণাযন্ত্রে বেঁধে দিলেন রাজনৈতিক স্বরাজের সুর। এই সকল পথের কোরাস সংগীত দিয়ে শুরু হলো স্বাধীন ভারতবর্ষ গঠনের জন্য যুদ্ধ; সুভাষ হলেন তার মহাধিনায়ক। বিশ্বের সকল ঘটনাকে বাস্তবতার লাশকাটা ঘরে কাটাছেঁড়া করে, তিনি শত্রু-মিত্র জটিলতাকে সহজ সরল রূপ দিলেন, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ যার অন্যতম চালিকাশক্তি। দেশবিরোধী শক্তি তাঁকে নানান গালমন্দে ভূষিত করল, খসে পড়ল নানান ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক মুখোশ। কিন্তু নেতাজী অনন্য। আত্মত্যাগ ছাড়া যে রাজনীতির লড়াইয়ে শাশ্বত জয় সম্ভব নয়, তা তিনি ভারতবাসীকে, ভারতের রাজনীতিবেত্তাদের বুঝিয়ে দিলেন। রাজনৈতিক মঞ্চে যতদিন না তাঁর সংগ্রাম, চরিত্রশক্তি, নিঃস্বার্থপরতা, মানবিকতা, প্রাণময়তা, অভিজ্ঞতাকে আমরা মূলধন না করবো

ততদিন তাঁর আত্মার শান্তি নেই, রাজনৈতিক পরগাছা থেকে মুক্তি নেই ভারতবর্ষের। আত্মত্যাগের বাণীই ছিল নেতাজীর রাষ্ট্রচেতনার মূলতত্ত্ব, এটা যেন আমরা মনে রাখি।

সাভারকরের সঙ্গে নেতাজী

পরাধীনতা থেকে ভারতবর্ষের মুক্তিলাভ যে আজাদ হিন্দ ফৌজের কারণেই ঘটেছিল, তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার। —'সুভাষচন্দ্রের 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠনের ফলে ইংরেজ বুঝিতে পারিল, প্রধানত যে ভারতীয় সিপাহি সৈন্যের সহায়তায় তাহারা ভারতবর্ষ জয় ও এতদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, অতঃপর তাহাদের উপর আর নির্ভর করা যায় না। সুতরাং ইংরেজ শ্রমিকদল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াই ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল।'

ড. মজুমদারের মতো এখনও ভারতবর্ষের অসংখ্য ইতিহাসপ্রেমী প্রবুদ্ধ মানুষ মনে করেন, ভারতের মুক্তিলাভের কৃতিত্ব একলা মহাত্মা গান্ধীর প্রাপ্য নয়। হৃদকম্প বাড়ানো দুটি ঘটনার পর ব্রিটিশরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ দৌত্যকার্যের সূত্রপাত করেছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লক্ষ্যে। প্রথম, জাপানি সৈন্য রেঙ্গুন দখলের পরে পরেই ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিতে ভারতে আসেন ব্রিটিশ দূত স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস; আজাদ হিন্দ ফৌজ তখন জাপানে দানা বাঁধছে। দ্বিতীয়, নেতাজীর বীরত্বে ও কর্মে দেশীয় সেনানীদের মধ্যে ইংরেজদের প্রতি আনুগত্যের শিথিলতা ঘটলো। তাই নৌ-বিদ্রোহের পরদিন ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, স্বাধীন ভারতের সংবিধান সংক্রান্ত কাজে শীঘ্রই ভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে মিলিত হতে আসবেন তিনজন সদস্যের ক্যাবিনেট মিশন। তাছাড়া ১৯৪৭ সালের অনেক আগেই গান্ধীর সক্রিয়তা বন্ধ হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে গান্ধীর ডাকে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ ও পরিত্যক্ত হয়েছিল। ফলে ১৯৪৭ সালে এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেনি, যার জন্য রাজ্যপাট ছেড়ে চলে যাওয়া যায়। প্রকৃত কারণ অবশ্যই নেতাজী এবং তার আজাদ হিন্দ ফৌজ। ব্রিটেনের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছিলেন নেতাজী। ক্ষমতা হস্তান্তর পর্বে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির ঐতিহাসিক উদ্ধৃতির সাক্ষ্য হাজির করিয়েছিলেন ড. মজুমদার। অ্যাটলি পরে স্বীকার করেছেন, ইংরেজদের তাড়াহুড়ো করে ভারত ত্যাগের মূল কারণ হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, সেখানে গান্ধীর কার্যকলাপের প্রভাব ন্যূনতম।

সমাজের বোধ অনুসারে নেতা ত্রিবিধ। উত্তম, মধ্যম ও অধম, সে রাজনৈতিক নেতাই হোন আর সামাজিক আধ্যাত্মিক নেতা! উত্তম নেতাকে দেশ, জাতি কম সময়ের জন্য পায়। তারা অনেকটা 'উসকো কাঠি'-র মতো, আমাদের চেতনায় কেবল অগ্নি প্রজ্বলন করতেই আসেন। আমাদের বোধের দোরগোড়ায় আলো দেখিয়ে যান, চিন্তা-চেতনাকে ওলট-পালট করে যান— এক প্রবল ঘূর্ণিঝড় যেন। উত্তমকে বেশি সময় বাঁধা যায় না, প্রয়োজনও হয়তো নেই। উত্তম নিজেও জানেন, তার কাজ ফুরোলে আর বিলম্ব নয়... । পৃথিবী বরং মধ্যম নেতাদের পেয়েই সুখে থাকে। পৃথিবী গড়পড়তায় মধ্যম মানকেই চিরায়ত করতে চেয়েছে, হয়তো পেরেছে। উত্তমের দ্যুতি সইতে পারার ক্ষমতা আমাদের নেই, সেই প্রবল ঝড় যদি একবার শুরু হয়, তা আটকানোর সাধ্যি নেই কারো। মধ্যম নেতা নিজেও তা ভালোভাবে জানেন। সব প্রতিষ্ঠানেই উত্তমের রাজ্যাভিষেক এক বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা। তাই বেহুঁশ হয়ে আমরা উত্তমকে নিত্য খুন করি, সতত গায়েব করি, তাকে অপ্রাসঙ্গিক করার সার্বিক চেষ্টায় রত হই। কিন্তু তার জ্যোতি এতটাই, তার স্বরূপ এতই চিরায়ত, তাকে চাপা দিয়ে রাখা যায় না, ঠিকরে বেরিয়ে আসে বলার্কপ্রভর মতো, ইতিহাসের অমল পাঠে তা বারবার ফিরে আসে।

মধ্যম নেতাকে নিয়েই মানুষ খুশি থাকেন। মধ্যম তার মধ্যবিত্ত মানসিকতা দিয়ে মানুষের খুশির ভোল বদল করিয়ে নিতে জানেন, জানেন কখন উত্তমের নামে জয়ধ্বনি দিতে হয়, কখন উত্তমকে

তোজোর সঙ্গে নেতাজী

হিটলারের সঙ্গে নেতাজী

রাসবিহারী বসুর সঙ্গে নেতাজী

আচ্ছামতো গালমন্দ করে নিজের নোলা-সাম্রাজ্য বজায় রাখতে হয়। মধ্যম মানে হলো অধমকে ব্যবহারের অপূর্ব মুন্সিয়ানা। পৃথিবী মধ্যমকে জয়ী করাতে চায় বলেই মধ্য-মেধার এত জৌলুস! উত্তমের রয়েছে 'স্টাইল', একান্তই নিজস্ব, অমৃতের ঐশী চেতনা-সম্ভূত। মধ্যমের রয়েছে 'ফ্যাশন', যেন নিউমার্কেট থেকে কেনা বিদেশি পরবের সস্তা-পোশাক!

অধমকে চিরকাল মধ্যম নেতা 'ভর' করেছে। বেচারা বুঝতেও পারেননি। সে নেতা হবার যোগ্য নয়। মধ্যমান সংরক্ষণের সে এক ঐতিহাসিক 'বোড়ে'। অধমকে ব্যবহার করে মধ্যম উত্তমের বলিদান প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করেছে। তারই পারিতোষিক দেওয়ার প্রক্রিয়া জারি ইদানীং। অধমের বংশানুক্রমিক ভরণপোষণের দায়-দায়িত্ব নিয়েছে যেন! মানুষের অনন্ত লোভ-মোহ-ইচ্ছে মানুষকে উত্তম চেনার চোখ চিরকাল রুদ্ধ করে রেখেছে। মানুষ যতদিন না মধ্যমণিকে সোনার গোপাল বলে জড়িয়ে রাখবে ব্রজ-বালককে সে খুঁজে পাবে না। ভবের মাঝি, আমায় কী উত্তম নায়ে নিতে পারো না? ছাড়িলাম মধ্যম নাও/দুরন্ত সমুদ্রে/হারালাম মাঝের বোধ/মানসিক শূদ্রে। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এমনই এক বিরলতম উত্তম নেতা। যার নৌকোয় ভাসলে দেশ অখণ্ড ও সুরক্ষিত থাকতো। তাই কবিশেখর কালিদাস রায় 'সুভাষ তর্পণ' করতে গিয়ে বলেছিলেন,

'নহ তুমি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভীম, নহ যুধিষ্ঠির
গীতামন্ত্র শুনিবার একমাত্র যোগ্য তুমি বীর।
এ যুগে গাণ্ডীবী তুমি, তুমি মহারথ,
তোমা বক্ষে ধরি ধন্য এ মহাভারত।'

(লেখক বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

করোনা মহামারীর কারণে আমরা দীর্ঘদিন স্বস্তিকার মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করতে পারিনি। কিন্তু অনলাইনে স্বস্তিকার ওয়েবসাইট সংখ্যা যথাসম্ভব নিয়মিত স্বস্তিকার পাঠক /গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ওয়েবসাইট সংখ্যা প্রকাশের জন্য স্বস্তিকা দপ্তর সচল রাখার ব্যয়ভারও স্বস্তিকা বহন করেছে। এমতাবস্থায় বর্তমানে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো স্বস্তিকারও আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়।

তাই স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি ও বার্ষিক গ্রাহকদের কাছে বিশেষ আবেদন, যাঁদের গ্রাহক মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁরা সত্বর গ্রাহকমূল্য (৫০০ টাকা) পাঠিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করুন। কারণ, এই করুণ আর্থিক সঙ্গতিতে ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে বকেয়া গ্রাহকদের স্বস্তিকা পাঠিয়ে যাওয়া আমাদের সামর্থ্যের বাইরে।

আশারাখি, আমাদের অসহায় অবস্থার কথা অনুভব করে স্বস্তিকার প্রকাশনা সচল রাখতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

সারদা প্রসাদ পাল
প্রকাশক, স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

বহিরাগত তত্ত্ব বুমেরাং, সংকটে মমতা

ধীরেন দেবনাথ

কথায় বলে, 'বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ।' একথা তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে প্রযোজ্য। কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের বুদ্ধিনাশা না হলে ভিন রাজ্যের বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বহিরাগত বলতে পারে? বহিরাগত বলতে বোঝায় বাইরে থেকে বা বিদেশ থেকে আসা (coming from outside; foreign)। তাহলে প্রশ্ন, যেসব বিজেপি নেতা বা মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে আসেন এরাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে, তাঁরা কী বিদেশি, বহিরাগত? তবে কী পশ্চিমবঙ্গ অন্য কোনও দেশ? বহিরাগত তত্ত্ব যে তৃণমূলনেত্রী তথা এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত তাতে নেই কোনো সন্দেহ। কারণ একনায়কতান্ত্রিক দলে এমনটাই দস্তুর।

সেই কারণেই হয়তো বিরোধীদের বক্তব্য, 'তৃণমূলে একটাই পোস্ট, আর সব ল্যাম্পপোস্ট।' তাঁদের আরও বক্তব্য, বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা বিজেপির নেতৃবৃন্দ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা যদি এ রাজ্যে বহিরাগত হন, তাহলে অন্যান্য রাজ্যে কর্মসূত্রে থাকা বা বসবাসরত বাঙ্গালিরা তবে কী? নিশ্চয়ই বহিরাগত। প্রশ্ন উঠেছে, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা-নেত্রী ও মন্ত্রীরা যদি এরাজ্যে বহিরাগত হন, তবে তৃণমূলকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী করানোর ঠিকাদার বা কাণ্ডারি প্রশান্ত কিশোর কী? তৃণমূলের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে আইনি লড়াই চালানো আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি, কপিল সিব্বলরা কী? তৃণমূল ঘনিষ্ঠ পুলিশ অফিসার রাজীব কুমার বা এরাজ্যে কর্মরত বিভিন্ন রাজ্যের বাসিন্দা ও সরকারি কর্মচারীরাও কি বহিরাগত নন? বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা, নেত্রী ও মন্ত্রীরা এ রাজ্যে প্রচারে এলে তাঁরা বহিরাগতের তকমা পান। আর এ রাজ্যে বসবাসকারী, বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী মানুষজন এরাজ্যের ভূমিপুত্রের তকমা পান কোন যুক্তিতে? কেন 'এক যাত্রায় পৃথক ফল'? কেনই-বা ভারতবাসীর মধ্যে এই বিভাজন সৃষ্টি করা? কোন যুক্তিতে তৃণমূল দলের নাম 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস'? কেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের আনা বিভিন্ন বিলের বিরোধিতা করতে তারা গান্ধী-আম্বেদকরদের মূর্তির নীচে ধরনায় বসেন? তবে কী তাঁরা আপনাদের দৃষ্টিতে বহিরাগত নন? ভূমিপুত্র? বিজেপি যদি আপনাদের কাছে বহিরাগতদের দল হয়, তাহলে বিগত লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী হিসেবে আপনি সারা ভারতের একুশটি বিজেপি-বিরোধী দলকে নিয়ে কলকাতা ময়দানে বিশাল জনসমাবেশ করেছিলেন কোন যুক্তিতে? ওইসব দলের নেতা-নেত্রীরা তখন আপনার কাছে বহিরাগত বলে মনে হয়নি?

তৃণমূলনেত্রী যখন বুঝলেন, তাঁর বহিরাগত তত্ত্ব ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে, তখন তিনি সেই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটিয়ে 'বহিরাগত'-র সঙ্গে 'সংস্কৃতি' জুড়ে দিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করলেন। কিন্তু তা করে কি ভবি ভোলানো যায়? বরং 'বহিরাগত সংস্কৃতি' তত্ত্ব খাড়া করে ডেকে আনলেন আর এক রাজনৈতিক বিপর্যয়। কারণ অন্য রাজ্যের বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা যদি এরাজ্যে বহিরাগত সংস্কৃতি আমদানির দোষে দুষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে তো রাম ও কৃষ্ণ বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ না করার সুবাদে ভিন দেশী। তাই যদি হয়, তবে 'হরে কৃষ্ণ...হরে রাম' নাম-সঙ্কীর্তনও অপসংস্কৃতির দ্যোতক হতে বাধ্য। এরাজ্যের রাম ও কৃষ্ণ ভক্ত মানুষ কী তৃণমূলনেত্রীর ফতোয়াকে মেনে নেবেন? এরাজ্যে বসবাসকারী বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজনও কী তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতি পালন বন্ধ রাখবেন?

বাঙ্গালি জাতীয়তা বা বাঙ্গালিয়ানাকে উসকে দিয়ে তৃণমূল নেত্রী ভোট নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চাইছেন। ফলে এ রাজ্যের অবাঙ্গালি তৃণমূলের ঘর ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে।

তৃণমূলিরা এখন যেনতেন প্রকারেণ ভোটে জিতে ক্ষমতা দখলে রাখতে চাইছে। তাই বিগত দশ বছরের অপশাসন, দুর্নীতি, তোলাবাজি, কাটমানি, রাজনৈতিক হত্যা, বেকারত্ব ইত্যাদি অপকর্মকে রাজ্যবাসীর স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে আঞ্চলিককতাবাদ, বহিরাগত ও বহিরাগত সংস্কৃতি তত্ত্ব এবং বাঙ্গালি ভাবাবেগ জাগিয়ে তুলতে চাইছে, যা আগুন নিয়ে খেলার শামিল। সত্যি বলতে, তৃণমূলের বহিরাগত তত্ত্ব সারা ভারতে বাঙ্গালি বিদ্বেষের জন্ম দিতে পারে। এর শিক্ষা অসমের 'বঙ্গাল খেদাও' আন্দোলন থেকে পেয়েছি। তৃণমূলিদের কি তা অজানা? এবার সেই বাঙ্গালি বিদ্বেষ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লে তার বিষময় ফল ভোগ করতে হবে এই রাজ্যের বাঙ্গালিকেই। তার দায় নিতে হবে তৃণমূলকে। পরমত সহিষ্ণুতা, বিবিধ ভাষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার যে ঐতিহ্য রয়েছে বাঙ্গালির, তা হবে ধূলিসাৎ। বাঙ্গালি জাতীয়তা বা বাঙ্গালিয়ানাকে উসকে দিয়ে তৃণমূল নেত্রী ভোট নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চাইছেন। ফলে এ রাজ্যের অবাঙ্গালি তৃণমূলের ঘর ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন জনসভায় 'জয় বাঙ্গলা' স্লোগান দেন, যা বাংলাদেশের শাসকদল আওয়ামি লিগের স্লোগান। এছাড়াও তিনি পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলে 'বাংলা' করার পক্ষপাতী। মুসলমান তোষক রূপেও লাভ করেছেন সুখ্যাতি। ভিন রাজ্য থেকে এরাজ্যে আগত বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের বলছেন বহিরাগত। এসবই কী পশ্চিমবঙ্গকে 'পশ্চিম বাংলাদেশ' বানানোর ষড়যন্ত্র নয়? বহিরাগত তত্ত্ব ও অপশাসন তাদের দিকে মৃত্যুবান হয়ে ফিরে আসছে। তাকে রোধ করার ক্ষমতা আর তৃণমূলিদের নেই। তৃণমূল ছিন্নমূল হবেই। □

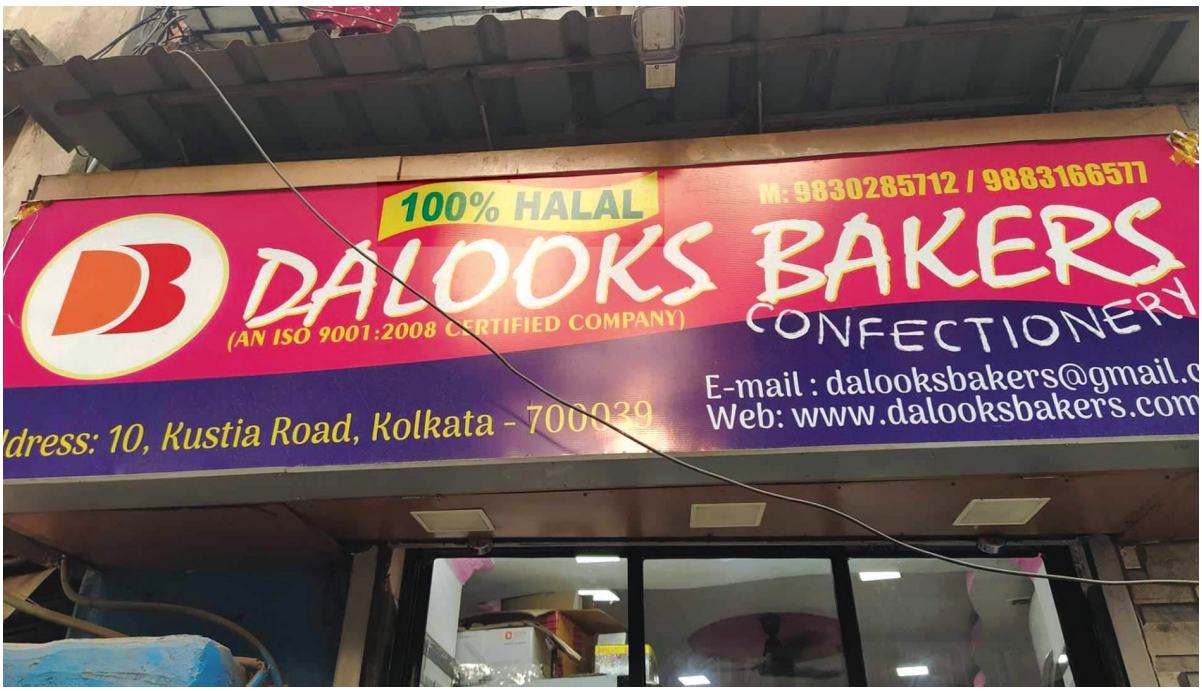

হালাল ব্র্যান্ডের রমরমায় ভারসাম্য হারাচ্ছে অর্থনীতি

জীবানন্দ ভট্টাচার্য্য

গত মে মাসে চেন্নাইতে একটি ঘটনা ঘটেছিল। এক জৈন বেকারির মালিকের বিরুদ্ধে আইপিসির বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। তাতে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে সেই বেকারিতে গ্রাহক পরিষেবার জন্য সমস্ত জিনিস একমাত্র জৈন ধর্মীয় কারিগর দ্বারা বানানো হয় এবং কোনো মুসলমান কর্মীকে এই সংগঠনে নিযুক্ত করা হয় না।

সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং হোয়াটস অ্যাপে বিজ্ঞাপনটি ভাইরাল হওয়ার পর পুলিশ বেকারির মালিককে গ্রেপ্তার করে এবং তার বিরুদ্ধে আইপিসির ১৫৫ (দাঙ্গা উস্কে দেওয়া) ৫০৫ (অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপরাধ প্ররোচিত করা) এবং ২৯৫-এ (এক শ্রেণীর মানুষকে অপমানিত করা) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়।

সেই সময়ে সারা দেশে এ ধরনের আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল এবং আমাদের দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা এইসব ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রং দিয়ে দেশে অস্থির বাতাবরণ নির্মাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সনাতনী সংস্কৃতিকে বদনাম করা। এই প্রসঙ্গে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে দুটি ফলের দোকানে 'হিন্দু ফলের দোকান' লেখার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড় হয়েছিল।

এক মুসলমান যুবক এই ফলের দোকানদুটির ছবি টুইটারে আপলোড করে এবং ঝাড়খণ্ড পুলিশকে ট্যাগ করে। তারপর ঝাড়খণ্ড পুলিশ জামশেদপুর পুলিশকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিলে পুলিশ সংশ্লিষ্ট ফলের দোকানগুলি থেকে পোস্টার সরিয়ে দেয় এবং আইপিসির ১০৭ধারায় মামলা দায়ের করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়াতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। হিন্দুরা দাবি করতে শুরু করলো যে হিন্দু দোকান লেখার জন্য যেভাবে দোকানদারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, ঠিক সেভাবে হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও অন্য যেসব দোকানে 'হালাল' বা 'মুসলমান হোটেল' লেখা রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কেন একই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না?

হালাল একটি আরবি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে মুসলমানদের জন্য অনুমোদিত বা বৈধ। হালাল ইসলামের খাদ্য নিয়ম, বিশেষ করে যা মাংসের সঙ্গে সম্পর্কিত। কুরানে বর্ণিত হালাল প্রক্রিয়া অনুসারে মুসলমানদের কেবল হালাল মাংস খাওয়ার জন্য ফতোয়া জারি করা হয়েছে। হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে যে সকল প্রাণী বলি দেওয়া হয় সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ঝটকা। মুসলমানদের শরিয়া আইনের আওতায় ঝটকা মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। মুসলমানরা কখনও ঝটকা মাংস খায় না, অন্যদিকে হিন্দুদের হালাল মাংস খেতে কোনও আপত্তি নেই। যদি আপনি কোনও হিন্দুকে ঝটকা মাংস খেতে বলেন তবে তিনি

আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা করবেন। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সারা দেশে ঝটকা ব্যবসা মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বর্তমান সময়ে ঝটকা ব্যবসার মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হলেও আগামীদিনে যদি কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে নিশ্চয়ই ঝটকা ব্যবসা সমাপ্তির পথে যাবে।

তার কারণ হচ্ছে আজ থেকে দশ বছর আগেও হিন্দু সমাজ এই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নেয়নি এবং এই মারাত্মক ভুলের জন্য সনাতন সমাজকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। এখন তো হালাল একটি ব্র্যান্ড হয়ে গেছে এবং এটি কেবল মাংসের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। এখন খাবার, পানীয়, ওষুধপত্র, প্রসাধনী ও ব্যক্তিগত বস্তু, বেকারি পণ্য, পুষ্টিকর ওষুধ এবং আয়ুর্বেদিক ওষুধপত্র ইত্যাদি সব জিনিস হালাল মানদণ্ডের আওতায় এসে গেছে।

সাধারণত, বিশ্বের প্রতিটি দেশে খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন, সংগ্রহ, বিক্রি, স্বচ্ছতা, পুষ্টি ও খাদ্যের মানদণ্ড ইত্যাদি মানক পদ্ধতিগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রাধিকরণ কাজ করছে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Food & Drug Administration, ভারতে Food Safety and Standard Authority of India ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কোনও ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করে না। কিন্তু যারা ইসলাম অনুসরণ করে তারা তাদের সমাজকে আলাদা ভাবে পরিচিত করার জন্য এবং কেবলমাত্র মুসলমান সমাজের স্বার্থকে সামনে রেখে এই Halal Certifications শুরু করেছে।

Halal Certification আমাদের দেশে ২০১২ সাল থেকে শুরু হয়েছে। দিল্লি ভিত্তিক সংস্থা Global Islamic Sharia Services হচ্ছে ভারতের প্রধান হালাল সার্টিফিকেশন সংস্থা। অনেক ইসলামিক দেশে সরকার থেকেই এই সার্টিফিকেট জারি করা হচ্ছে। ভারতে প্রায় এক ডজন সংস্থা আছে যারা ইসলাম অনুসারীদের জন্য খাবার এবং পণ্য ব্যবহারের অনুমতি ও গ্যারান্টি দেয়। দেশের অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদন যাতে ইসলামি দেশগুলোতে রপ্তানি করা যায় তার জন্য তাদের উৎপাদন দ্রব্যকে হালাল সার্টিফিকেশন করিয়ে নেয়। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে মুসলমান জনসংখ্যা ১৮০ কোটি এবং এই জনসংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার ২৪ শতাংশ। এছাড়াও অনেক ইসলামিক দেশে রপ্তানির জন্য হালাল সার্টিফিকেশনকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্তমানে হালাল খাদ্য-বাজার বিশ্বের খাদ্য-বাজারের প্রায় ১৯ শতাংশ এবং এই হালাল বাজার খুব দ্রুত গতিতে বাড়ছে। এভাবে এই বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের বিষয়টি মাথায় রেখে পতঞ্জলির মতো অনেক সংস্থা তাদের পণ্যের জন্য হালাল সার্টিফিকেশন করছে। এখন প্রশ্ন হলো, মানুষ কেন হালাল সার্টিফিকেশনের বিরোধিতা করছে?

ভারতের সংবিধান যে কোনও ব্যক্তিকে তার ধর্মীয় বিশ্বাসের বা পছন্দের অনুরূপ পণ্য দাবি করার অধিকার দিয়েছে। মুসলমানরা এই অধিকারেই দাবি করতে শুরু করেছে, যে সমস্ত পণ্য তারা ব্যবহার করে সেটা যেন ইসলামের মূলনীতি অর্থাৎ হালাল নিয়ম অনুযায়ী হয়। এই পরিস্থিতিতে এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিগোর মতো বিমান সংস্থা তাদের খাদ্য তালিকায় শুধু হালাল শ্রেণীর মাংসকেই বাধ্যতামূলক করেছে। শুধু তাই নয়, এখন দেশে অনেক সংস্থা অনলাইনে কাঁচা মাংস বিক্রি করছে। Licious, Fresh to home, Easy meat, Zapp fresh ও Meatigo ইত্যাদি। অনেক কোম্পানি লিখে দিচ্ছে যে তাদের ব্যবসা নীতি অনুযায়ী শুধুমাত্র হালাল মাংসই তারা বিক্রি করবে। লজ্জার ব্যাপার যে, দেশে ১৮ শতাংশ মুসলমান হালাল খেতে চায় আর তাই তাদের পছন্দ মতো ৮০ শতাংশ হিন্দুদের উপর হালাল চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এর অর্থ সংবিধানে যে ধর্মীয় বিশ্বাসের বা পছন্দের অনুরূপ পণ্য দাবি করার যে অধিকার দেওয়া হয়েছে বহুসংখ্যক হিন্দু সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখন হালাল কেবল মাংসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করছে। মাংস থেকে শুরু করে প্যাকেজজাতীয় খাবার, সৌন্দর্য প্রসাধনী, ওষুধপত্র ইত্যাদি সব জিনিসই হালাল ব্র্যান্ডে পাওয়া যাচ্ছে। ভারতে হালালোনোমিস্ক যে গতিতে বাড়ছে তা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামি ব্যবস্থায় হালাল একটি সমান্তরাল অর্থনীতি, ভারতের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করলে এটি ভালো লক্ষণ নয়।

হালালোনোমিস্ক প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো গত কয়েক বছর ধরে নিজস্ব কর্মসংস্থান যেমন কাঠমিস্ত্রি, প্লাম্বার, ইলেকট্রিশিয়ান, বাইক এবং গাড়ি মেকানিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে হিন্দুদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে ও এ ধরনের কর্মসংস্থানে বেশিরভাগ মানুষ মুসলমান সম্প্রদায়ের দেখা যাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে হিন্দুরা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য এইসব ক্ষেত্রে কাজ করতে দ্বিধা বোধ করে। তার ফলে বর্তমানে বেকারত্বের ক্ষেত্রে দেশে হিন্দুদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমেরিকার এক শীর্ষস্থানীয় বৈশ্বিক বাজার গবেষণা সংস্থা Research & Market-এর মতে হালাল খাদ্য-বাজার ২০১৮ সালে ১.৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল এবং এই বাজার বার্ষিক ১১ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি হচ্ছে। এই হিসেবে ২০২৪ সাল নাগাদ বিশ্ব হালাল বাজার সম্ভবত ২.৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে।

এই ভয়ানক পরিস্থিতি মোকাবিলায় সনাতন সমাজের কী করা উচিত? ভারত একটি পন্থনিরপেক্ষ দেশ। সুতরাং সরকারের এই ব্যাপারে কিছু করার নেই। হিন্দু সমাজকেই এই কাজের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

ভারতের মতো দেশে যেখানে সনাতন সমাজ নিজেদের মধ্যে বিভক্ত, সেখানে হালালের বিপরীতে হিন্দু ব্যবস্থা কার্যকর করা একটু কঠিন। কেবল মুসলমানদের দ্বারা নয়, আমাদের নিজস্ব লোকজন দ্বারাও প্রতি ক্ষেত্রে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। বর্তমান সময়ে যদি আমরা হালাল থেকে মুক্তি পেতে চাই তাহলে আমাদের হালাল খাদ্য পরিত্যাগ করতে হবে। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে সমগ্র দেশে মিডিয়ার মাধ্যমে সনাতনী সমাজকে সচেতন করতে হবে তারা যেন হালাল বর্জন করে। একই সঙ্গে হালাল থেকে আমাদের সমাজব্যবস্থায় যে খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে সচেতন করতে পারি। যেসব কোম্পানি হালাল ব্র্যান্ডকে উৎসাহিত করছে এবং হিন্দুদের হালাল খেতে জোর করে আমাদের ধর্মীয় ভাবনাকে আহত করছে তাদের বর্জন করতে হবে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের দেশে হিন্দুদের একটা বড়ো অংশ নিরামিষ ভোজন গ্রহণ করেন যেমন ইসকন অনুগামী, জৈন ও স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়। বিদেশেও একটি বড়ো অংশ এই শ্রেণীভুক্ত। তাদের দরকার চাই হিন্দু ধর্মীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী খাদ্য পদার্থ। বর্তমানে আহমেদাবাদ স্থিত International Hindu Promotion Council নামক একটি সংস্থা এধরনের হিন্দু প্রমাণপত্র জারি করা শুরু করেছে। বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ হিন্দু। যদি আমরা আন্তরিক ভাবে এই ব্যাপারে এগিয়ে আসি তাহলে হালাল থেকে সনাতন সমাজকে মুক্ত করতে পারব। ▯

সুলতানি আমলেই বাঙ্গলায় মন্দির তৈরিতে নবজাগরণ?

উপরোক্ত শিরোনামে ৬ ডিসেম্বর একটি পত্রিকার রবিবাসরীয়তে এক পণ্ডিত মহাশয় লিখিত নিবন্ধটি পাঠ করে চমৎকৃত হলাম। পুরো নিবন্ধে পাঠককে বিভ্রান্ত করা হয়েছে মাত্র। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী মুসলমান শাসকরা ভারতে ৪০০০ হাজার থেকে ৫০০০ হাজার হিন্দু মন্দির ভেঙেছে সেখানে সুলতানি আমলে বাঙ্গলায় মন্দির তৈরিতে নবজাগরণ কতটা বিশ্বাসযোগ্য? আমরা ইতিহাস থেকে জানি ৭১২ খ্রিস্টাব্দে বিন কাশিমের নেতৃত্বে ভারতে মুসলমান আক্রমণ ঘটে এবং তখন থেকেই মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরির ট্র্যাডিশন শুরু হয়। এরপর সুলতান মামুদ ১০০০ হাজার সালে এবং পরে আরও ১৭ বার ভারত অক্রমণ করে ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা চালায়। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের ওপর নির্মিত মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করে হিন্দুর রক্তে মথুরা বৃন্দাবনের মাটি কর্দমাক্ত করেছিল। হিন্দু মহিলাদের সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তাদের গজনির দাসবাজারে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি করা হয়। সুলতান মামুদ সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করে সেখানে আশ্রিত ৫০ হাজার সাধু, সন্ন্যাসী এবং ভক্তকে হত্যা করে। তারপর ধনসম্পদ লুঠ করে সোমনাথের বিগ্রহটি ভেঙে টুকরো টুকরো করে গজনিতে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন মসজিদ ও প্রাসাদের সোপানশ্রেণীতে প্রোথিত করা হয় যাতে সেগুলি নিয়মিতভাবে পদদলিত করা যায়। এরপর সবুক্তিসিন, মহম্মদ ঘোরি, তৈমুর লং, আহমেদ শাহ আবদালি, নাদির শাহ প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। বাবরের সেনাপতি মিরবাকি রামজন্মভূমিতে নির্মিত বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গেও যাচ্ছি না। তবে শোনা যায় আকবরের সেনাপতি মানসিংহ সকালে ৩ ঘণ্টা শিবের পুজো করে আকবরের নির্দেশে হিন্দু মন্দির ভেঙে আসতেন। ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ভেঙে সেখানে জ্ঞানবাপী মসজিদ তৈরি করা হয়। দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ পুরীর জগন্নাথ মন্দির তছনছ করে ১ লক্ষ ভক্তকে হত্যা করে জগন্নাথের বিগ্রহটি উপড়িয়ে সঙ্গে করে দিল্লি নিয়ে গিয়ে একটি অপবিত্র স্থানে ফেলে রাখেন। দিল্লির বাদশাহ, সুলতানরা যা কিছু করেছেন অর্থাৎ মন্দির ভাঙা, ইসলামে ধর্মান্তরিত করা অন্যথায় হত্যা করা এসব কিছুই পবিত্র কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বাঙ্গলার সুলতান, নবাবরা পবিত্র কোরানের নির্দেশ উপেক্ষা করে মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন বা মন্দির নির্মাণে সহযোগিতা করেছেন এটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য? বাঙ্গলার সুলতান হোসেন শাহর আমলে (মতান্তরে আকবরের আমলে) আল্লোপনিষদ নামে একটি কিতাব রচিত হয়। উপনিষদের সঙ্গে আল্লাহতালার কী সম্পর্ক জানা নেই। এই হোসেন শাহর আমলেই সত্যনারায়ণের নামে সত্যপির বা পিরের পুজো চালু হয়। সেই পিরের পুজো হিন্দু বাড়িতে এখনও চলছে। সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে রয়েছে 'ফকির বলে হাসি শুন বিপ্রবর। বেদ বা কোরান কিছু নাহি মতান্তর। যেই রাম সেই রহিম নাম একই হয়। ত্রিলোকে নাহিক দুই কহিনু নিশ্চয়। 'সত্যপির ছাড়াও আছে মাণিক পির, নিয়াজি পির-সহ আরও কিছু। চন্দননগরে রয়েছে দুটি সত্যপিরের এবং একটি নিয়াজি পিরের থান। শুধু হিন্দু মহিলারাই সেখানে পুজো দিতে যান। আমি একজন পুরোহিতকে প্রশ্ন করেছিলাম আপনি যে বললেন 'বেদ ও কোরানে কিছু নাহি মতান্তর তা আপনি কি কোরান পড়েছেন? 'উনি বললেন উনি বেদ পড়েছেন তবে কোরান পড়েননি। আমি প্রশ্ন করলাম' কেন তাহলে কোরানের কথা বললেন? 'উনি নিরুত্তর রইলেন। এবার আসা যাক মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে। হুগলি জেলার পাণ্ডুয়ায় মসজিদ, বাঁশবেড়িয়ায় মন্দির ভেঙে বিরাট দরগা, গৌড়ের বড়ো সোনা, ছোটো সোনা-সহ বহু হিন্দুমন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের কাজির সঙ্গে বাদানুবাদের গল্প আমরা জানি। কিন্তু তৎকালীন বাঙ্গলার সুলতান হোসেন শাহয়ের আক্রমণের আশঙ্কায় শ্রীচৈতন্যকে বাঙ্গলা ছেড়ে পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্রের নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হয়েছিল সেটা আমরা কতজন জানি?

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

স্বস্তি পেলাম স্বস্তিকাতে

বহুদিন পরে হাতে পেলাম আমার প্রিয় পত্রিকা 'স্বস্তিকা'। এতদিন অস্বস্তিকর অবস্থায় ছিলাম। বহুকাল থেকে পড়ছি, লিখে গর্বিত, পাঠে পরিতৃপ্ত। অসাধারণ সংখ্যা ৪ জানুয়ারির সংখ্যা। সম্পদসম রক্ষা করার মতন সংখ্যা। সম্পাদকীয়তে মনের কথা টেনে বলেছে। কালরোগ করোনার জন্য স্বস্তিকা প্রকাশকে স্তব্ধ করেছিল। ২০২১ সাল সবার ভালো কাটুক, স্বস্তিকার প্রচার ও প্রসার সংখ্যা বৃদ্ধি পাক এটাই কামনা করি।

—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়,
১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

কমিউনিস্টদের সমূলে উৎপাটন করতে হবে

গত ১৩ ডিসেম্বর পরিণত বয়সে প্রয়াত হলেন সিপিএমের প্রাক্তন এমপি রাধিকাবাবু। পরবর্তীকালে তিনি টিএমসি-তে যোগ দেন। টিএমসি-তে যোগদানের পর তার একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। চন্দন পিড়িতে গত ৪.৫.২০০৪ তারিখে এক জনসভায় তিনি বলেন— 'আমি আগে যে দল করতাম, তার যে কোনো অফিসের দেওয়ালে দেখবেন চারজন কোট-প্যান্ট পরা সাহেবের ছবি— মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্টালিন। প্রথম দু'জন এক অদ্ভুত চারাগাছ আবিষ্কার করেছিলেন। অন্য দু'জন তা রাশিয়ার মাটিতে পুঁতে একে মহীরূহে পরিণত করেছিলেন। সেই বৃক্ষের ফল খেয়ে মরেছে রাশিয়ার মানুষ। এদেশের কমিউনিস্টরা সেই

ফঃ ৩

চারা গাছ পুঁতেছে পশ্চিমবঙ্গে। এটাকে সমূলে উৎপাটন করুন। না হলে ধনেপ্রাণে মরবেন।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলকাতা-৬৪।

অমর্ত্যবাবুর প্রতি কিছু কথা

অমর্ত্যবাবু, নতুন করে আপনার কোনো পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই, আপনার মেধার তুলনা শুধু আপনি নিজেই। আপনি ভারতীয় হিসেবে অর্থনীতিতে নোবেল পেয়ে অবশ্যই আমাদের গর্বিত করেছেন এবং দেশের সর্বোচ্চ সম্মান ভারতরত্নে ভূষিত হয়েছেন আপনার নিজের যোগ্যতাতেই। আপনাকে প্রশ্ন করার মতো ধৃষ্টতা দেখানো আমার উচিত নয় কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে আপনার আচরণ অত্যন্ত বেদনাদায়ক, তাই কিছু কথা না বলে থাকতে পারলাম না।

খাদ্য সংকট নিয়ে আপনার গবেষণা আপনাকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছে, খাদ্য সংকটের কারণ হিসেবে তথাকথিত FAD (Food Availability Decline) তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করে আপনি 'Entitlement Failure' তত্ত্বের প্রবর্তন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ আপনি বলেছিলেন একটি তুলা চাষির উৎপাদিত তুলা নিজের ঘরে রেখে দেওয়া বা বিক্রি করা বা বিক্রি করে অন্য কিছু কিনে নেওয়ার Entitlement থাকা উচিত। বর্তমান ভারত সরকার কৃষি বিপণন আইনে (APMC Act) যে সংস্কার আনা হয়েছে তাতে তো কৃষকদের উপযুক্ত Entitlement দেওয়া হয়েছে যার ফলে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল তাদের পছন্দের ক্রেতাকে বিক্রি করতে পারবে। আপনার গবেষণাতেই আপনি উল্লেখ করেছেন যে খাদ্য সংকটের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র একটি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা প্রাচীরের ন্যায় কাজ করে। ১৯৫৯-৬১-তে কমিউনিস্ট পরিচালিত চীনে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তা অন্য কোনো গণতান্ত্রিক দেশ হলে হতো কিনা সে নিয়ে বহু অর্থনীতিবিদ প্রশ্ন তুলেছেন। অর্থাৎ Entitlement তত্ত্বকে মেনে নিয়েও একথা অনস্বীকার্য যে খাদ্যের পর্যাপ্ত জোগান না থাকলে খাদ্যসঙ্কট অবশ্যম্ভাবী। ভারতবর্ষে প্রতি বছর প্রায় ৯২ হাজার কোটি টাকার শস্য নষ্ট হয় পর্যাপ্ত হিমঘর না থাকার জন্য। এর জন্য প্রধান অন্তরায় ছিল অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন (ECA Act 1955), বর্তমান ভারত সরকার এই আইনে যে সংশোধনী এনেছে তার ফলে হিমঘরে বিনিয়োগের বিপুল রাস্তা খুলে গেছে সাধারণ যুবক-যুবতীদের জন্য। যার ফলে একদিকে যেমন উৎপাদিত শস্যের সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে, অপরদিকে কর্মসংস্থানের রাস্তাও খুলে যাবে। এই যুগান্তকারী কৃষি সংস্কার আনার জন্য যারা বর্তমানে কৃষকদেরকে ভুল বুঝিয়ে রাস্তায় নামিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে, আপনি কি মোদী সরকারকে সাধুবাদ জানিয়ে সেই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সরব হবেন নাকি মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে নিজের নোবেলজয়ী গবেষণাকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলে দেবেন?

মোদীর শাসনকালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিয়ে আপনি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলেছেন। আপনার কাছে কি সংখ্যালঘু বলতে শুধু একটি বিশেষ ধর্মের মানুষকে বোঝায়? নিকিতা তোমরকে যখন প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে খুন করা হয় লাভ জিহাদের জন্য তখন কি আপনার মনে লাভ জিহাদের আগ্রাসন নিয়ে কোনো প্রশ্ন জেগেছিল? সেই বিশেষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গে যখন সিএএ-এর প্রতিবাদের নাম করে দাঙ্গা করেছিল তখন কি আপনার মনে কোনো প্রশ্ন জেগেছিল? বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার হয়ে আসছে তা নিয়ে আপনি কোনোদিন সরব হয়েছেন? আপনার কাজ তো দুর্ভিক্ষের উপর। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের উপর প্রচুর কাজ হয়েছে। একবারও তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের ভূমিকা নিয়ে একলাইনও কিছু বলেছেন?

বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে কোনো একটি দুঃখজনক ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন মানুষকে প্রাণ হারাতে হলে গণতন্ত্রের ভিত্তি নড়ে যায় আপনার কাছে। সাঁইবাড়ির খুনিদের একবারও কিছু বলেছিলেন? মরিচঝাঁপির হত্যার পরে? বিজন সেতু থেকে নেতাই গণহত্যার সময় খুনিদের একবারও কোনো পরামর্শ দিয়েছিলেন?

বাকি রইল বাক্‌স্বাধীনতা। একাধিক ইউটিউবার ব্লগার এবং দেশের প্রথম শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন মোদী বিরোধিতা করে জনমানসে মোদীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি করার। তাদের উপর সরকারিভাবে কোথাও কোনো কোপ নেমে আসেনি— গণতন্ত্রে যেটা অভিপ্রেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে বাক্‌স্বাধীনতা নিয়ে আপনি একাধিকবার সরব হয়েছেন। জানতে ইচ্ছে করে, ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে আপদকালীন সময়ে বাকস্বাধীনতা নিয়ে আপনি কখনো প্রশ্ন করেছেন কিনা? পশ্চিমবঙ্গে বাকস্বাধীনতা না ছিল গণশক্তির যুগে না আছে 'জাগো বাঙ্গলা'র যুগে! সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা আরামবাগ টিভির সাংবাদিকদের উপর কী হয়েছে জানেন? CTVN-এর উপর কি হয়েছিল জানেন? সামান্য একটি অনলাইন ব্লগ The Bengal owl-এর সঙ্গে কি হয়েছে জানেন?

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের স্বপ্নের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পটিকে আপনি কার্যত দায়িত্ব নিয়ে ডুবিয়েছেন। ৯ মাসের কন্ট্রাক্ট থেকে যিনি ৯ বছর স্বাচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারেন, তিনি যে ১৩ ডেসিমেল জমি জবরদখল করে রাখতে পারেন এ নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা কমিটিতে থেকে আপনি আমাদের প্রিয় প্রেসিডেন্সিকে লোহিয়া-কোনার প্রাইভেট লিমিটেডে পরিণত করে দিয়েছেন।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তৈরি করে লক্ষাধিক বাংলাদেশি মানুষের অর্থনীতিতে উপকার করেছিলেন মহম্মদ ইউনিস। তার জন্য তিনি নোবেল পেয়েছিলেন। অবসরের ঊর্ধ্বসীমা অতিক্রম করে যাওয়ার জন্য তাকে সেই গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। তাহলে কেন আমাদের দেশে শুধুমাত্র নোবেলজয়ী বলে আপনাকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হতে থাকবে?

বহুদিন বিদেশে বসে দেশের বিভিন্ন কমিটিতে বসে ভালোই দিন কেটেছে আপনার। এখন সব কমিটি হাতছাড়া। তাই বোধহয় চা-ওয়ালার ওপর আপনার খুব রাগ। যদি গান্ধী পরিবারের থেকে আবার একটা রিমোট কন্ট্রোল কাউকে এনে বসানো যায় তবেই শেষ জীবনে আপনার কোনো কমিটিতে ফোকটে জায়গা হতে পারে। আপনার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভাড়া করা বুদ্ধিজীবীর দল তো আছেই— চেষ্টা চলিয়ে যান। আমরাও আছি, আমাদের চা-ওয়ালার সঙ্গে।

—রুদ্রপ্রসন্ন ব্যানার্জী,
অ্যালবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা।

স্নেহলতা কোওল

আশা ও উদ্যমের প্রতীক

সুতপা বসাক ভড়

কাংড়ার স্নেহলতা জীবনের প্রারম্ভেই মা-বাবাকে হারায়। এরপর দাদা তাকে বড়ো করে তোলে। ট্র্যাক্টর চালানো শিখে সে পরিবারকে সামান্য হলেও আর্থিক সাহায্য করার চেষ্টা করেছে। তারপর গাড়ি সারিয়ে তোলায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে সে। প্রথম ইলেকট্রিশিয়ানর পাঠ নেয়। এরপর টেকনিশিয়ান হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চালানোর কাজও শিখে নেয়। মহিন্দ্রার মোটর ওয়ার্কশপে সে তার পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতায় নিজের কুশলতার প্রমাণ রেখে চলেছে।

২২ বছরের স্নেহলতা তার অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে প্রেরণাদাত্রীর ভূমিকা নিয়েছে। হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার শাহপুর অঞ্চলের মনেই গ্রামে বসবাস করে সে। জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার জন্য গাড়ি মেরামতের কাজকেই সে বেছে নিয়েছে। বিদ্যালয়ের পড়াশুনা সাঙ্গ করে শাহপুরের আই টি আই থেকে ইলেকট্রিশিয়ানের কোর্স করে। এই সময় মহিন্দ্রা অ্যান্ড মহিন্দ্রার মোটর ওয়ার্কশপে কাজ করার সুযোগ পায়। এই সুযোগ সে হাতছাড়া করেনি। ওয়ার্কশপে টেকনিশিয়ান ট্রেনিরূপে অন্যান্যদের মধ্যে সে ছিল একাই মহিলা। নিজের কাজ মন দিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক যানবাহন সারানো শিখে নেয়। তাকে সাহায্য করার জন্য এবং এই কাজে উৎসাহ দেবার জন্য ওয়ার্কশপের ম্যানেজার এবং ম্যানেজিং কমিটির অন্যান্য সদস্যরাও এগিয়ে আসেন। প্রত্যেকে স্নেহলতার কাজ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে সম্মান জানান।

স্নেহলতা খুব ছোটোবেলায় তার মা-বাবাকে হারায়। বাবা সুরেশ কুমার মারা যান ২০০৬ সালে এবং ২০০৯ সালে মা বৃশমা দেবীর মৃত্যু হয়। বাড়ির সব দায়িত্ব এসে পড়ে বড়োদাদা বিনয় কোওলের ওপর। সে তার দায়িত্ব পালন করে। ট্রাক্টর চালিয়ে বিনয় নিজের ছোটো ভাই-বোনেদের পড়াশুনার ব্যয় বহন করেছে। এদিকে পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে স্নেহলতা বড়োদাদাকে সাহায্য করার জন্য ট্রাক্টর চালানো শেখে। এইভাবে সে মেকানিক এবং পরে টেকনিশিয়ান হয়ে ওঠে। তার ছোটোভাই পবনও অনুপ্রাণিত হয়ে আই টি আই-তে টার্নার ট্রেড-এর কোর্স করছে। স্নেহলতা পারম্পরিকভাবে পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং প্রথমদিকে সে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। যে কোনো কাজ হোক না কেন, যদি তা একাগ্রতার সঙ্গে করা যায়, তবে সাফল্য তো আসবেই। ওয়ার্কশপে সবার সহযোগিতায় সে মন দিয়ে কাজ শিখে নেয়। ওয়ার্কশপ ম্যানেজার রাকেশ ঠাকুর জানান যে, কোম্পানির এমডি হলেন একজন মহিলা, নাম— শিল্পা গ্রোভার। তিনি এই কাজে যুবতীদের এগিয়ে আসার জন্য এবং তাদের উপার্জনের ব্যবস্থা করার জন্য আগ্রহী। সেজন্য তাঁর দিক থেকে স্নেহলতার জন্য এটি একটি বিশেষ সুযোগ ছিল। বর্তমানে স্নেহলতা সেখানকার তরুণী এবং যুবতীদের কাছে প্রেরণা।

ওই অঞ্চলের একজন সমাজসেবী সঞ্জয় শর্মা বলেন, 'এই মেয়েটিকে দেখে মনে হয়, বাস্তবে মেয়েরা কোনো অংশে কম নয়। আজও আমাদের সবার প্রেরণা। আমি এই অঞ্চলের মেয়েদের বলি যে দারিদ্র্য এবং সমস্যা নিয়ে বসে না থেকে সাহস ও উদ্যমের সঙ্গে এগিয়ে যাও, নিজেদের পায়ে দাঁড়াও।'

জীবনে প্রতিকূলতা থাবা সত্ত্বেও স্নেহলতা থেমে থাকেনি। বড়োদাদা বিনয় কোওলের ছত্রছায়ায় থেকে সে পরিবারের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। নতুন শিক্ষা গ্রহণ করে সেই পথে নিজেকে স্বচ্ছন্দ করে তুলেছে। সমাজের বিধি-নিষেধকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাওয়ার পথে সাহায্য এসেছে শ্রীমতী শিল্পা গ্রোভারের থেকে। এই ভাবে সে একাগ্রচিত্তে মনোযোগ দিয়ে তার কাজ করে চলেছে এবং স্থানীয় মানুষজনের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কর্মের প্রতি স্নেহলতার এই উদ্যাম এবং নিষ্ঠা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য! □

সুস্থ থাকতে হাত ধোওয়ার প্রয়োজন কেন ?

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

হাত পরিষ্কার রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস, যার মাধ্যমে সহজেই কমপক্ষে ২০ ধরনের অসুস্থতা থেকে বাঁচা যায়। শুধু হাত ধোওয়ার মতো স্বাস্থ্যকর অভ্যেস ডায়রিয়ার ঝুঁকি প্রায় অর্ধেক কমিয়ে দেয়। বলা হয়, সঠিক নিয়মে হাত ধোওয়ার অভ্যাস একটি ভালো ভ্যাকসিনের চেয়ে বেশি কাজ করে। আমরা করোনা মোকাবিলা করতে গিয়ে বুঝতে পারছি যে হাত ধোওয়া কীভাবে ভ্যাকসিনের কাজ করে। মানুষ মাঝেমধ্যেই অন্যমনস্কভাবে তাদের চোখ, নাক বা মুখে হাত দেয়। এভাবে চোখ, নাক বা মুখের মাধ্যমে হাতে থাকা জীবাণু শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তাই নিয়মিত হাত ধোওয়া উচিত। প্রতিবারই খাবার সময় হাত ধুতে হবে। রোগ প্রতিরোধে হাত ধোওয়ার ভূমিকা এখন শুধু হাসপাতালে সীমাবদ্ধ নয় বরং স্কুল, কলেজ, রেস্তোরা সবখানেই স্বীকৃত। তাই নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময় পরপর হাত ধোওয়া উচিত।

কীভাবে জীবাণু ছড়াতে পারে :

টয়লেট ব্যবহারের পর ভালোভাবে হাত না ধোওয়ার কারণেই সাধারণত জীবাণু সবচেয়ে বেশি ছড়ায়। হাত না ধুয়ে খাবার তৈরি বা পরিবেশন করলে হাতে থাকা জীবাণু খুব সহজেই খাবারে প্রবেশ করতে পারে। হাত থেকে জীবাণু অন্যান্য জায়গাতেও ছড়িয়ে পড়ে। যেমন সিঁড়ির রেলিং, টেবিল, খেলনা, মোবাইল যা থেকে অন্য মানুষের হাতে জীবাণু ছড়ায়। সুতরাং কিছুক্ষণ পর পর হাত ধোওয়া ডায়রিয়া, শ্বাসনালির সংক্রমণ, ত্বক ও চোখের সংক্রমণ থেকে আমাদের বাঁচায়। এছাড়া কফ, হাঁচি, কাশি থেকে জীবাণুর সংক্রমণ হয়। দূষিত কোনো কিছুর সংস্পর্শে এলেও মানুষের হাতে জীবাণু আসতে পারে। হাতে লেগে থাকা জীবাণু যদি ধুয়ে না ফেলা হয় তাহলে শুধু যিনি বাহক তিনিই নন, তাঁর সংস্পর্শে যাঁরাই আসবেন, সবাই সংক্রামিত হতে পারেন।

কখন হাত ধোওয়া উচিত :

খাবার তৈরির আগে এবং পরে।
খাওয়ার আগে।
অসুস্থ কারও সেবা করার আগে এবং পরে।
পায়খানা ও প্রস্রাবের পরে।
শিশুর ডায়াপার বদলানো বা শিশুর পায়খানা পরিষ্কারের পরে।
নাক ঝাড়া, কফ ফেলা বা হাঁচি দেওয়ার পরে।
কোনো পশুপাখি বা পশুপাখির খাবার বা পশুর বিষ্ঠা ধরার পরে।
পোষা জীবজন্তুর খাবার ধরার পরে।
আবর্জনা বা ময়লা ধরার পরে।

হাত ধোওয়ার ভুল :

১০-১৫ সেকেন্ডের কম সময় ধোওয়া।

সাবান ব্যবহার না করে শুধু জল দিয়ে হাত ধোওয়া, হাত ঘষে সাবানের ফেনা না করে ধোওয়া অথবা সাবান ব্যবহারের পর তা ভালোভাবে জল দিয়ে ধুয়ে না ফেলা। হাতের পেছনের অংশ, আঙুলগুলোর ফাঁকের জায়গা ও নখের নীচের অংশ পরিষ্কার না করা।

একবার ব্যবহার করা জলে পুনরায় হাত ধোওয়া অথবা বাটিতে জল নিয়ে সেই জলে একাধিক জনের হাত ধোওয়া। একই তোয়ালেতে সবার হাত মোছা। হাত মোছার তোয়ালে মাঝে মধ্যে পরিষ্কার না করা।

মনে রাখবেন :

জল বা সাবান না থাকলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যায়। তবে হাত খুব বেশি ময়লা হলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার হাত থেকে সব জীবাণু এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ দূর করতে পারে না।

এখন সাবান সহজলভ্য। তাই মাটি বা ছাই নয়, অবশ্যই সাবান ও পরিষ্কার জল দিয়ে হাত ধোওয়া উচিত। হাত ধোওয়ার জল ময়লা হলে চলবে না। □

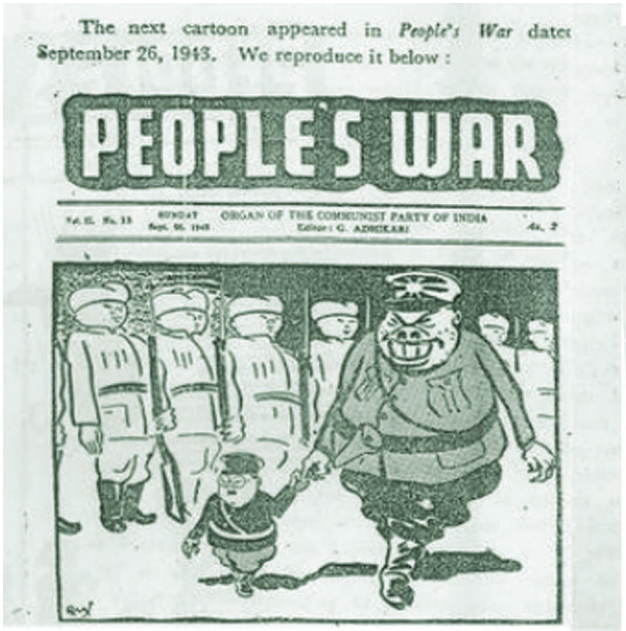
The next cartoon appeared in *People's War* date September 26, 1943. We reproduce it below :

PEOPLE'S WAR

ORGAN OF THE COMMUNIST PARTY OF INDIA

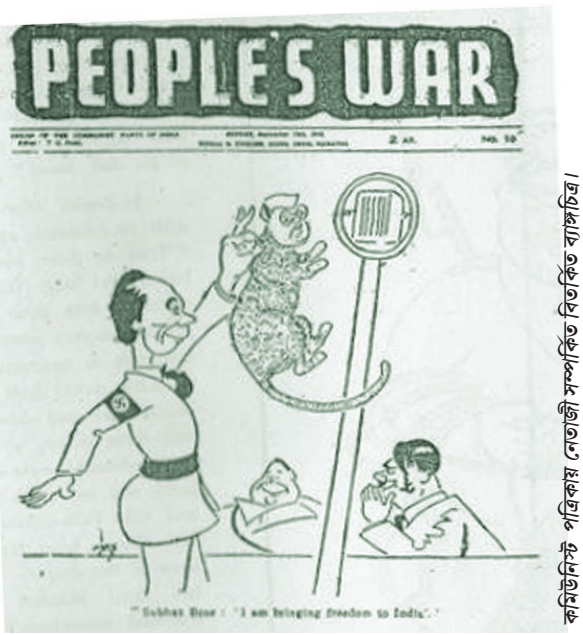
PEOPLE'S WAR

"Subhas Bose : 'I am bringing freedom to India'."

কমিউনিস্ট পত্রিকায় নেতাজী সম্পর্কিত বিতর্কিত ব্যঙ্গচিত্র।

নেতাজীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কমিউনিস্টরা

পূরবী রায়

১৯২০-এর প্রথমদিকে কমিনটার্নের ইস্টার্ন সেকশন বা প্রাচ্য বিভাগে ভারতীয় কমরেডদের একে অপরের প্রতি বিরূপ মন্তব্য, কার্যসমালোচনা সব মিলিয়ে ক্রমশ এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলছিল। কমরেড মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রাচ্য বিভাগের সেক্রেটারির কাছে কমরেড অবনী মুখার্জির বিরুদ্ধে লিখিত প্রতিবাদ জানালেন।

এমন এক প্রতিকূল পরিবেশে অবনী মুখার্জি প্রিসিডিয়াম সদস্য ব্র্যান্ডলার ও প্রফিনটার্নের সদস্য কমরেড লসোভস্কির অনুমতির সাহায্যে ভারতে যাবার ছাড়পত্র পেলেন। প্রত্যাবর্তনে কমরেড অবনী কমরেড পেত্রোভকে (মস্কোস্থিত কমিনর্টানের ইস্টার্ন সেকশনের সেক্রেটারি) একটি রিপোর্ট দিলেন— 'Report of Indian Situation and my one and half year's work there'. ২২.৮.১৯২৪ তারিখের এই রিপোর্টে সুভাষচন্দ্রের নাম উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন : 'The right hand man of C.R. Das, Mr. S. Bose, being pro-communist and a friend of ours, we have a good influence over the Swaraj Party'।

অপরদিকে সেই সময়েই ১৯২১ সালে আইসিএস উত্তীর্ণ সুভাষের চাকরি থেকে পদত্যাগ এবং আগামীদিনে দেশের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে ইংল্যান্ড থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন। দেশে ফিরেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এক জাহাজে। কবির ইচ্ছা ও কথামতো বোম্বাইয়ে নেমে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের আলোচনা তেমন ভাবে ফলপ্রসূ না হওয়ায় সুভাষ কলকাতায় তাঁর কর্মগুরু দেশবন্ধুর সঙ্গে দেশের কাজে নিযুক্ত হন।

সেই সময়েই কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের চতুর্থ কংগ্রেসে নিমন্ত্রিত ভারতীয় প্রতিনিধিদের তালিকায় দেশবন্ধু-পুত্র চিররঞ্জন, সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের নাম অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নিয়ন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়। সুভাষচন্দ্র এই নিমন্ত্রণ পেয়েও কংগ্রেসে যোগদান করার অনুমতি পাননি।

যখন অবনী মুখার্জি ও নলিনী গুপ্ত কলকাতায় আসেন সুভাষচন্দ্র সেই সময় দেশবন্ধুর মাধ্যমে যোগাযোগ এবং নানা বিষয়ে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন। ফলে এইসব কার্যকলাপ ব্রিটিশের চোখ এড়িয়ে যায়নি। ব্রিটিশ তখন যে কোনো অছিলায় তাঁকে বন্দি করতে প্রস্তুত। ভিত্তিহীন অভিযোগ সাজিয়ে পুলিশ বিনা বিচারে ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ফলে ১৯২৪-১৯২৭ সাল পর্যন্ত বিনা বিচারে বর্মার মান্দালয় জেলে তিনি কাটান।

দীর্ঘদিনের কারাবাসে থেকে মুক্তি পেয়ে দেখলেন রাজনৈতিক পটভূমিকার নানা প্রকার পরিবর্তন। ১৯২৮ সালে নিখিল বঙ্গীয় যুব সম্মেলনে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে সভাপতির অভিভাষণের বক্তব্যে তিনি বলেন— ''সমাজের পুনর্গঠনের জন্য আজকাল পাশ্চাত্য দেশে নানা প্রকার মত ও কর্মপ্রণালীর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় যথা— Social-

নেতাজীর পরিবারের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদী

ism, State Socialism, Guild Socialism, Syndicalism, Philosophical Anarchism, Bolshevism, Fascism, Parliamentary Democracy, Aristocracy, Absolute Monarchy, Limited Monarchcy, Dictatorship ইত্যাদি।" ...তাঁর মতে... "এই ক্রমোন্নতিশীল জগতে কোনো কোনো মতকে চরম সত্য বা চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত কাজ নহে। ...কোনো দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানকে সমূলে উৎপাটন করিয়া আনিয়া বলপূর্বক অন্যদেশে রোপণ করিলে সুফল না ফলিতেও পারে। প্রত্যেক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয় সেই দেশের ইতিহাসের ভাব ও আদর্শ এবং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজন হইতে।" ...তিনি আরও বলেন, 'Marxism-এর তরঙ্গ এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে... রাশিয়াতে যে বলশেভিজম্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সহিত Marxian Socialism-এর মিল যতটা আছে— পার্থক্য তদপেক্ষা কম নহে।'

...'পরাধীন দেশে যদি কোনো 'ism' সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহা Nationalism.'

সুভাষচন্দ্র তাঁর Indian Struggle গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ১৯২৮-১৯২৯ সালে ভারতীয় তরুণদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব নবচেতনার উন্মেষ ঘটে। সমসাময়িক কালে দেখা যায় কংগ্রেস, মানবতাবাদী বামপন্থী, জাতীয় বিপ্লবীমঞ্চ এবং কমিউনিস্টরা একত্রিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতি টানবার প্রচেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে। এমতাবস্থায় শঙ্কিত ব্রিটিশরাজ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ১৯২৯ সালে শ্রেণী সংগ্রামী ৩১ জন বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে গ্রেপ্তার করে। এরপরই মীরাট Cospiracy Case।

সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের গভীর রণকৌশল বারে বারে ব্রিটিশের অন্তরায় হয়ে দেখা দেওয়াতে--- ব্রিটিশ সিদ্ধান্ত নিল সুভাষচন্দ্রের শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসার কারণ দর্শিয়ে দেশ থেকে তাঁকে বিদায় করে দেওয়াই শ্রেয়। সেইমতো ১৯৩৩ সালে চিকিৎসার জন্য তাঁকে Central Europe-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ইউরোপের চিত্রটা ছিল ভিন্ন। সুভাষচন্দ্র আসার বহু আগে থেকেই ইউরোপের নানা রাজ্যে ভারতীয় বিপ্লবীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। একদিকে শ্রী শ্যামজী কৃষ্ণ ভার্মা, সর্দার সিংহ রানা, মাদাম ভিকাজী কামা, অপরদিকে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নলিনী গুপ্ত ও আরও অনেকের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বলশেভিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। আমেরিকায় গঠিত গদর পার্টি প্রাচ্য দেশগুলির প্রতি কমিনটার্নের কীরূপ দৃষ্টিভঙ্গী সে সম্পর্কে নজর রেখে চলছিল। ইতিমধ্যে মস্কোয় Communist University of the Toilers of the East (KUTV) কর্মরত— যেখানে প্রাচ্যের বিপ্লবীরা ছাড়াও গদর পার্টির বহু সদস্য বার্লিন হয়ে মস্কোর KUTV-তে প্রশিক্ষণ নেয়। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছোটো বোন সুহাসিনী KUTV-তে শিক্ষা নিতে এসে এ.সি.এন. নামবিয়ারের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলেও নামবিয়ার পরবর্তীকালে অস্বীকার করেন। হিটলারের উত্থানে বীরেন্দ্রনাথ বা চট্টোকে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যেতে হয় এবং সেখানে তিনি উর্দুর শিক্ষক হিসাবে শিক্ষকতা শুরু করেন। নামবিয়ার জার্মানি ছেড়ে চলে যান প্রাগে, সেখানে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সুভাষচন্দ্র ইউরোপে এসে অনুভব করেন যে ভারতে কী হচ্ছে সে সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার অতি সযতনে বহির্বিশ্ব থেকে সেই বার্তা সরিয়ে রেখেছে। সুভাষচন্দ্র পূর্ব ইউরোপে ভ্রমণ করে উপলব্ধি করেন যে ইউরোপের বহু রাজ্যেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে কৌতূহল ও সহানুভূতির লক্ষণ স্পষ্ট। সুতরাং বিভিন্ন ধরনের যোগসূত্র প্রস্তুত করে সাফল্যের সঙ্গে রাষ্ট্রদূতের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। নামবিয়ার তাঁর অত্যন্ত নিকটতম ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে Indian Legion-এর সমগ্র দায় দায়িত্ব সুভাষচন্দ্র তাঁর ওপর সমর্পণ করেন। অথচ বিশ্বস্ত নামরিয়ার ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সুভাষ-অনুগামী হয়েও এবং সোভিয়েতের প্রতি প্রথম থেকে বিশ্বস্ততা রেখেও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে তিনি সম্পূর্ণভাবে নেহরুর ও পরে ইন্দিরা গান্ধীর অনুগামী হয়ে ওঠেন।

বার্লিনে সুভাষচন্দ্রের একমাত্র ভরসা সোভিয়েত সংবাদ সংস্থা টিএমএসএস— যার মাধ্যমে বহু সংবাদ বিনিময় হতো। এই সংবাদগুলি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে রাশিয়ায় ব্যুরো প্রধান সর্বদাই বার্লিনের কার্যালয় মারফত ভারত সংক্রান্ত খবর পেতেন।

সুভাষচন্দ্র ইউরোপে থাকাকালীন ভারতের অভ্যন্তরে নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। বামপন্থীরা মোটামুটি একত্র হওয়ার প্রবণতা দেখালেন এবং কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থীদের প্রভাব চিত্তাকর্ষক মাত্রায় না হলেও তলে তলে বৃদ্ধি পেল। স্বাভাবিকভাবে এই পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্র তখন দেশে ফিরে বিপ্লবী আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করার সংকল্প নিলেন।

তিরিশের দশকে ইউরোপে থাকাকালীন, দেশের স্বাধীনতার স্বার্থে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সহায়তা ও সহানুভূতি আদায়ে তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করেন। এইসব কাজে কখনও বা নামবিয়ারের সহায়তায় পরিকল্পনা গঠন করা, বার্লিনে টিএএসএস-এর সহায়তায় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা তাঁর কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুভাষচন্দ্রের এই সকল কার্যকলাপের নিখুঁত হিসাব রাখা হতো কমিনটার্নের ভারত বিভাগের কার্যালয়ে। ১৯৩৬ সালে ২৩ মার্চ চার্লিকে লেখা গর্ডনের পত্রটি এর স্বাক্ষর বহন করে :

২৩ মার্চ ১৯৩৬

'প্রিয় চার্লি,

৮নং রিপোর্টটি সংযোজিত হলো— এতে বোস (নেতাজী সুভাষচন্দ্র) সম্বন্ধে বেশ কিছু

চিত্তাকর্ষক খোঁজ খবর আছে। আমাদের যতদূর ধারণা যে বোস দেশে ফেরার অনুমতি পাননি। এবং তার সমর্থনে চতুর্দিকে বেশ কিছু কাজকর্মও চলছে। আমি মনে করি বোসের সমর্থনে কার্যকলাপের যেসব বিবরণ আমরা পাচ্ছি তাতে আমাদের সমর্থন জানানোর কোনো প্রেক্ষাপট তৈরি হয়নি। হাউস অব কমনস্'-এ, এ ধরনের একটি প্রশ্নও উঠেছে এবং আমার ধারণায় বোসকে যদি দেশে ফেরার অনুমতি না দেয় তাহলে আমাদের কমরেডরা খামোকা একটা ঝামেলায় জড়াবে না।'

Sd/ Gordon
গর্ডন

সুভাষচন্দ্র বসুকে ভিয়েনার ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল সতর্কবার্তা পাঠিয়েছিলেন যে দেশে পা রাখলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। সুতরাং সুভাষচন্দ্র ১৯৩৬ সালে এপ্রিল মাসের প্রথমার্ধে বোম্বাই পৌঁছালে তাঁকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়। এর পরিবর্তে সুভাষের বার্তা ছিল— 'স্বাধীনতার পতাকা যেন মাথা তুলে থাকে।'

১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল, কারণ কংগ্রেসের সমগ্র দক্ষিণপন্থীরা বিরোধিতা করলেন। অপরদিকে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে রইলেন বামপন্থীরা। সেই সময়ে সিপিআই অবৈধ পার্টি হিসেবে চিহ্নিত। তখন পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি পিসি যোশী একটি বৈধ পত্রিকার সাহায্য নিয়ে 'Vote for Subhas' লিখে ব্যানার হেডলাইন করালেন। কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট কংগ্রেস এবং রয়েস্টি অর্থাৎ এম এন রায়ের অনুগামী ন্যাশনাল ফ্রন্ট সংযুক্তভাবে সুভাষকে সমর্থন জানিয়ে ভোট দিয়ে কংগ্রেসের প্রার্থী সীতারামাইয়াকে পরাজিত করলেন। সুভাষচন্দ্র বামপন্থীদের সাড়া জাগানো সমর্থনে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন বামপন্থীদেরই একটি পত্রিকায়... 'My hertiest Congratulations to the National Front for its consistent stand for the national line of struggle and for the unification and consolidation of left forces.'

১৯৩৯ সালে প্রাথমিকভাবে কমিউনিস্টদের সহায়তায় সুভাষচন্দ্র Left Consolidation Committee (LCC) প্রস্তুত করলেন। অপরদিকে এম এন রায়ের Congress Socialist Party-র বিহারের কৃষক নেতা স্বামী সহজানন্দের প্রভূত সাহায্য পেলেন। সব মিলিয়ে সময়টা এমন যে ভারতে প্রকৃত বাম ঐক্যের প্রজ্বলিত চিত্র পাওয়া গেল— এর কারণ সুভাষচন্দ্রের জন্য কমিউনিস্ট নেতাদের সহায়তায় ও সমর্থনে এইরূপ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্রও তাঁর ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তুর্যনিনাদ— স্থাপন করলেন All Indian Revolutionary Committee, যার কার্যনির্বাহ কমিটি দিল্লির সিপিআই দপ্তরে ১৬নং কুইন্স ওয়ে যা বর্তমানের জনপথ, যেখানে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সিপিআই-এর মনমোহন নাথ কাউরা। বর্তমানে ১৬নং জনপথ হচ্ছে মেরিভিয়ান হোটেল। এই অফিসে গুপ্ত সংকেত বা চ্যানেল হলো যার নাম MARY— সারা ভারতে কোথায় কীভাবে বামপন্থীরা কাজ করছেন তার গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করা ও যথাযথ স্থানে পৌঁছে দেওয়া ছিল MARY-এর কাজ।

যে উৎসাহ নিয়ে বামপন্থীদের একত্রে এনে সাড়া পাওয়া গিয়েছিল— তা প্রায় অস্তাচলে। কারণ সুভাষচন্দ্র আশা করেছিলেন যে ফরোয়ার্ড ব্লক প্ল্যাটফরমে সোশ্যালিস্ট, কমিউনিস্ট এবং রয়েস্টি সংযুক্তভাবে কাজ করবে— কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল বিচ্ছিন্নতা এবং তারা রাজি হলে না। এলসিসি-র মধ্যে দ্বন্দ্ব, মতবিরোধ, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ— সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ভাঙনের পথে এগিয়ে গেল। বিশেষত সত্যরঞ্জন বক্সী ও কামাথ ভীষণভাবে সোভিয়েত বিরোধী মত পোষণ করতে লাগলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে সুভাষ ও সিপিআই অনেকটাই একে অপরের নিকটবর্তী ছিল। এদিকে ১৯৪০ সালে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হওয়ায় সুভাষচন্দ্র দেশ পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন, যে সিদ্ধান্তের পিছনে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির এক বিরাট অবদান রয়েছে।

গদর পার্টির অচ্ছর সিংহ চিনা ছিলেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির এক পরিচিত ব্যক্তিত্ব। কমিনটার্নে তাঁর নাম ছিল 'লারকিন'। তিনি প্রায়শই বেআইনি পথে ভারতে এসে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। বিশেষত অজয় ঘোষের সঙ্গে। অচ্ছর সিংহ যখন সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগের ইচ্ছা জানতে পারেন তখন তাঁরই পরিচিত কমরেডদের সাহায্যে পুরো ঘুঁটিটা সাজিয়ে দেন। চিনার সহকর্মীদের সাহায্যে সুভাষচন্দ্র গৃহত্যাগ ও দেশত্যাগ করতে সক্ষম হন। সুভাষের মুখ্য উদ্দেশ্য সাহায্যপ্রার্থী হয়ে রাশিয়া যাওয়া।

অচ্ছর সিংহের সহযোগীদের সাহায্যে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে কীর্তি কিষান পার্টির সদস্য ভগৎরাম তলোয়ারের সাহায্যে কাবুল পৌঁছোন। এই সময়ে কাবুলে ছিল সোভিয়েত, জার্মান ও ইতালীয় দূতাবাস। সোভিয়েত দূতাবাসে কর্মকর্তাদের অন্যতম কেজিবি প্রতিনিধি যিনি 'জামান' নামে পরিচিত ছিলেন। এই এলাকায় কমিউনিস্টদের কাছে জামান পরিচিত নাম। ভগৎরামও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে জামানকে ভালোই চিনতেন। বিশেষত ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কার্যক্রম জামান ভগৎরামের মাধ্যমে সংগ্রহ করতেন। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের পৌঁছনোর সংবাদ কাবুলে সোভিয়েত দূতাবাসে পৌঁছোতে সময় লাগেনি।

জার্মান দূতাবাসেও খবর পৌঁছালো, কারণ সোভিয়েত জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি। ইতালীয় রাষ্ট্রদূত কৌরানি— তাঁর স্ত্রী ছিলেন রুশ। ভারতের নেতাদের সঙ্গে কৌরানির এক আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি তিরিশের দশকে বহুবার ভারতবর্ষ যান এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগের নেতাদের সঙ্গে

আলাপ পরিচয় ও মত বিনিময় প্রায়শই হয়ে থাকত।

কমিউনিস্ট পার্টির দপ্তরের গুপ্ত সংকেত MARY-এর সঙ্গে কাবুল ও বার্লিনের যোগাযোগ যথাক্রমে 'অলিভার' ও 'টম' নামে। ইতিমধ্যে ভগৎরাম মিত্র শক্তি ও অক্ষ শক্তির গুপ্তচর বৃত্তি করেও তার শেষ হতো জামানের কাছে আত্মসমর্পণ। ভগৎরাম নতুন পরিচিতি পেলেন 'সিলভার মুন' নামে। শুরু হলো তাঁর সোভিয়েত কেজিবি অফিসার জামানের তত্ত্বাবধানে গুপ্তচর বৃত্তি। সুতরাং MARY, 'OLIVER' ও 'TOM'— ভারতবর্ষের গুপ্ত চ্যানেল কাবুল ও জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সমস্ত গুপ্ত সংবাদ সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য যথাযথ জায়গায় পৌঁছে দিত। এরপর এই নেটওয়ার্ক আরও বিস্তৃত হলো বোস যখন বর্মায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর রণক্ষেত্রে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সুভাষচন্দ্রের একদিকে জাপানের সঙ্গে 'RHINO' নামে গুপ্ত চ্যানেলের যোগাযোগ, অপরদিকে জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হলো 'ELEPHANT' নামে । আর দুটি চ্যানেলেই দিল্লির 'MARY'-এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে লাগল। এই Secret Service-এর কর্মকাণ্ড হয়তো ভারতের অনেক কমিউনিস্টদের অজানা ছিল কিন্তু সিপিআই-এর নেতাদের অজানা এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়! বামপন্থী ইতিহাসবিদ এমনকী কংগ্রেসের নেতারা নানাভাবে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন, মূল রহস্যকে আড়াল করে আপন আপন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মূল রহস্যের উৎঘাটন সোভিয়েত মহাফেজখানা থেকে যা উদ্ধার করা গেছে তা সোভিয়েত সমাজ ভেঙে পড়ার পর। যেমন কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের হিটলার, মুসোলিনি ও জাপানিদের প্রতি সহানুভূতি ছিল এবং এই গুপ্ত চক্রের কথাও তাদের অজানা ছিল না।

সুভাষচন্দ্রের প্রচার ব্যবস্থায় দেখা যায় Indian legion-এর রেডিয়ো প্রচারে সোভিয়েত আক্রমণাত্মক সহযোগিতার বিরোধী ছিল, মস্কো রেডিয়ো সুভাষচন্দ্রের বহু ভাষণ প্রচারে সাহায্য করেছিল এবং নিঃশব্দে তাশখন্দ, ভাজিরিস্থান ও খাবারভস্ক এলাকাগুলি থেকে সরাসরি ভারতে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়। ১৯৪৩ সালে মস্কো রেডিয়োর ভারত বিভাগ আরম্ভ হয় এবং প্রথম ঘোষক ছিলেন গদর পার্টির উর্দুভাষী সদস্য— তাই উর্দুভাষাতেই ঘোষণা, সংবাদ প্রচার শুরু হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আপাতদৃষ্টিতে সৃষ্ট মিত্রশক্তি ও অক্ষশক্তি প্রধানত বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও ১৯৪৩ সালে যে ফৌজকে মাতৃসাধনার বিপ্লবী মন্ত্রে দিক্ষিত করে সুভাষচন্দ্র নেতৃত্ব দেন, গড়ে তোলেন 'আরজি হুকমতে আজাদ হিন্দ'— এও তো অপর একটি তৃতীয় শক্তি হিসেবে চিহ্নিত, বর্তমানে বহু হারিয়ে যাওয়া ঘটনা, তাদের নিপীড়ন জড়িত কাগজপত্র ধ্বংস করা হয়েছে, হয়তো বর্তমান প্রচেষ্টায় হারিয়ে যাওয়া নথিপত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। এর বিশদ বিবরণ ইতিহাসবিদ প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের History of the INA-র পাণ্ডুলিপিতে আজও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের মহাফেজখানায় ক্লাসিফায়েড দলিল হিসেবে দিন গুনছে।

যুদ্ধ শেষে ভারতে মিত্রশক্তির সোভিয়েত প্রধান গুপ্তচর মাইয়াদিয়ানৎস্ বোম্বাইতে সোভিয়েত বইপত্র প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন এবং তাঁর ভারতীয় কমিউনিস্টদের সঙ্গে আদান প্রদান বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তাঁর খুব নিকটতম সিপিআই ব্যক্তিত্ব ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী। ১৯৪৬ সালের জুলাইয়ের শেষে কয়েকদিনের জন্য মস্কো যান, প্রত্যাবর্তনে কমরেডরা সুভাষচন্দ্রের বিষয় উৎসাহ দেখালে সোমনাথবাবু সামান্য হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে যান।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে স্তালিন কোনো গুরুত্ব দেননি। তবে ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫২ বেশ কিছু সিপিআই সদ্যসের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে উৎসাহ দেখান ও নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। স্তালিনের বিশেষ পছন্দের ব্যক্তিত্ব শ্রীপাদ ডাঙ্গের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। ১৯৫১ সালে সিপিআই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে একটি বিশেষ বিষয় লক্ষণীয়, যা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কাছে পাঠানো হয়। বিষয়টি নজর কাড়ে যেখানে সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পর্কে উল্লেখ করে লেখা হয়... 'ভারতে সুভাষচন্দ্র বসুর নাম ক্রমশ মানুষের স্মৃতি থেকে বিলীন হয়ে মুছে যাচ্ছে— অপরদিকে ফরোয়ার্ড ব্লক পার্টি অস্তিত্বহীন'...?

১৯৫৩ সালে Generalissimo স্তালিনের মৃত্যুর পর ১৯৫৪ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকার নতুন উদ্যমে ভারত- সোভিয়েত মৈত্রী বন্ধন দৃঢ়তর করার উদ্দেশে পূর্ণ উদ্যোগ নিল। ১৯৫৫ সালে দুই দেশের প্রধানরা একে অপরের প্রতি আত্মবিশ্বাস স্থাপন করে ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম বিখ্যাত কংগ্রেসে অত্যন্ত গোপনীয়তা বজায় রেখে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে কমিউনিস্ট জগতের অধ্যায়ের ইতি টানলেন।

আজ দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী, মধ্যপন্থী সকল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ধ্বনিত হবে সুভাষচন্দ্রের চিন্তা ভাবনা— ইতিহাস ফিরে তাকাবে। তিনি বলেছিলেন, 'দেশ আজ ব্যক্তিতান্ত্রিক বিকাশ চায় না। দেশ চায় সমষ্টিগত সাধনা। ...যে পথই অনুসরণ করা হোক না, আমার মনে হয় সে সব নীতি সমষ্টি জীবনের ভিত্তি হওয়া উচিত, তাহা হইল— ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা ও প্রেম। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আমাদের আদর্শ— এই আদর্শই জয়যুক্ত হইবে।'

(প্রবন্ধে যে সকল তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে সবই সোভিয়েত মহাফেজখানা ভিত্তিক)

(লেখিকা বিশিষ্ট নেতাজী-গবেষিকা এবং প্রাবন্ধিক)

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী

পারুল মণ্ডলসিংহ

১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভারতবাসীকে আশীর্বাদ করেছিলেন যে 'তোমাদের চৈতন্য হোক।' সত্যদ্রষ্টা মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণদেব জানতেন যে একমাত্র চৈতন্য উদয় হলেই সমাজ তার প্রকৃত আদর্শ ও লক্ষ্যকে চিনতে শেখে। সত্যিই গত শতাব্দীর আরেক মহামানবকে চিনতে আমাদের বড্ড দেরি হয়ে গেল। স্বাধীনতার পর ৬০ থেকে ৭০ বছর লেগে গেল আমাদের চৈতন্যের উদয় হতে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু— এমন একজন মহামানবের নাম যাকে দোর্দণ্ডপ্রতাপ গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভয় পেত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনী, আদর্শ ও অবদান আমরা জেনেছি, যেটুকু আমাদের জানানো হয়েছে। কিন্তু কথা হলো নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যিনি তার জীবনের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিলেন ভারতবাসীর স্বাধীনতা দেবার জন্য, সেই সুভাষচন্দ্রকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভয় পেতেই পারে কিন্তু তৎকালীন এবং তথাকথিত স্বাধীনতা আন্দোলনকারী কংগ্রেস ও পরবর্তীকালে তাদের সরকার ভারতবাসীর কাছে তাঁকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল কেন? যিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিলেন এবং বিশ্বের বড়ো বড়ো দেশের সাহায্য নিতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি কোনো ভাবেই ভারতবর্ষে কংগ্রেস সরকারের কাছ থেকে সমর্থন পেলেন না, কোনো প্রকার সাহায্য পেলেন না। এখন যখন তার সাজানো অন্তর্ধান রহস্যের তথ্য মিথ্যে প্রমাণিত হচ্ছে তখন প্রশ্ন উঠতে পারে এত কিছু হওয়ার পরেও তিনি ভারতবর্ষে ফিরতে পারলেন না কেন?

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তার রাজনৈতিক জীবনের প্রথমার্ধ জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গেই কাটিয়েছেন। কিন্তু গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতা, কংগ্রেসের আপোশনীতি, রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি ও সব বিষয়েই মানিয়ে নেওয়ার নীতি নেতাজীর পছন্দ হয়নি। সেজন্যই সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজী কিন্তু নেতাজীর সভাপতি হওয়া মেনে নিতে পারেননি। নেতাজীর ব্যক্তিত্বের তেজ ও আপোশহীনতায় গান্ধীজী ভয় পেয়েছিলেন। যাইহোক নেতাজীর সেই সভাপতিত্বের পদ ছাড়তে বিন্দুমাত্র সময় লাগেনি। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে গান্ধীজীর নেতৃত্বে গোটা ভারতবর্ষে যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলন চলছে সেই সময় ভারতের অন্য একপ্রান্তে সবার অগোচরে এক বিশাল সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন নেতাজী। এই সংগ্রামের প্রস্তুতি শেষ হয়েছিল ১৯৪৩

সালের অক্টোবর মাসে। এই সংগ্রাম ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে নেতাজীর মনে বৈপ্লবিক চিন্তা ভাবনার উদয় হয়। তিনি গোপনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিরোধী মহা শক্তিধর দেশগুলির সাহায্য পেতে চেষ্টা করেন। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি অভিনব পন্থায় নিজ গৃহের নজরবন্দি অবস্থা থেকে ব্রিটিশ গুপ্তচরের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি দেশত্যাগ করেন। তিনি আফগানিস্তান হয়ে রাশিয়ায় পৌঁছান। যদিও রাশিয়া থেকে তিনি আশানুরূপ কোনো সাহায্য পেলেন না। বাধ্য হয়ে নেতাজী জার্মানিতে গেলেন। জার্মানি ছিল ব্রিটিশদের এক নম্বর শত্রু দেশ, সেইজন্য নেতাজী জার্মানির কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহী ছিলেন। যদিও জার্মানির রাষ্ট্রনায়ক হিটলার নেতাজীর সমস্ত দাবি মেনে নেননি। নেতাজী আশা করেছিলেন যে একটি স্বাধীন ভারত সরকারকে জার্মানি প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দান করবে। কিন্তু হিটলার তাতে

আজাদ হিন্দ সরকারের পতাকা উত্তোলনের ৭৫তম বর্ষপূর্তির শিলান্যাস করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রাজি হননি। অবশ্য জার্মানিতে 'আজাদ হিন্দুস্থান' নামক একটি বেতার তরঙ্গ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন। জার্মানির হাতে ধৃত প্রায় ৪০০ জন ভারতীয় সেনা নিয়েই সর্বপ্রথম আজাদ হিন্দ বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যরাই সর্বপ্রথম সুভাষচন্দ্র বসুকে নেতাজী বলে সম্বোধন করেছিলেন এবং 'জয় হিন্দ'-এর উদ্‌ঘোষ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ৪০০ জন সৈন্য নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল তার। সেই জন্য ১৯৪৩ সালে রাসবিহারী বসুর আহ্বানে তিনি জাপান যান। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত রাজবিহারী বসু ইংরেজ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে জাপান পালিয়ে এসেছিলেন। এখান থেকেই তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ গড়ে তুলেছিলেন। রাসবিহারী বসুর উদ্যোগেই ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মোহন সিংহের সেনাপতিত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গঠিত হয়। কিন্তু রাসবিহারী বসু লক্ষ্য করলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর আশানুরূপ প্রশিক্ষণ অগ্রগতি হচ্ছে না, সেই জন্য তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে জাপানে আহ্বান করেন। দীর্ঘ বিপদসংকুল সমুদ্রপথ অতিক্রম করে ১৯৪৩ সালের জুন মাসে নেতাজী জাপান পৌঁছান। সেখানে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তাকে স্বাগত জানান। নেতাজীর সঙ্গে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং তিনি ব্রিটিশদের থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য যথাসম্ভব সহযোগিতা দানের কথা ঘোষণা করেন। নেতাজীর সঙ্গে তোজোর এই মর্মে চুক্তি হয় যে আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানের নেতৃত্বে যুদ্ধ করবে তবে তাদের আলাদা রণক্ষেত্র দেওয়া হবে এবং মুক্তাঞ্চলগুলি আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতে সমর্পণ করা হবে। রাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের ভার এবং ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের নেতৃত্বে নেতাজীর হাতে সমর্পণ করেন। নেতাজী সিঙ্গাপুরে গিয়ে এই নেতৃত্বপদ গ্রহণ করেন।

১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত হলো আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এই আজাদ হিন্দ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, বিদেশ মন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ সি চ্যাটার্জি অর্থমন্ত্রী। ই এস আইয়ার এই সরকারের প্রচার মন্ত্রী এবং রাসবিহারী বসুর ছিলেন প্রধান পরামর্শদাতা। নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল জাপান, চীন, কোরিয়া, আয়ারল্যান্ড, জার্মানি, ফিলিপিনস প্রভৃতি দেশ। আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার একদিন পরেই নেতাজী আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তিনি জাতির উদ্দেশে ঘোষণা করলেন যে 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দোবো'। নেতাজীর 'দিল্লি চলো' ডাকে বহুদেশ সাড়া দিয়েছিল। ৩১ ডিসেম্বর জাপানের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্র বসু প্রথম মুক্তাঞ্চল হিসেবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপে পদার্পণ করেন। এই দুটি দ্বীপের নাম যথাক্রমে শহিদ দ্বীপ ও স্বরাজ দ্বীপ রাখা হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম পোর্ট ব্লেয়ারের জিমখানাতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের ত্রিরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন। নেতাজীর আজাদ হিন্দ সরকারকে ১৮টি দেশ স্বীকৃতি দিয়েছিল।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে আজাদ হিন্দ ফৌজের সুভাষ ব্রিগেড তিনভাগে বিভক্ত হয়ে আরাকান উপত্যকা হয়ে চট্টগ্রামের পূর্ব প্রান্তে বওডক ঘাঁটি জয় করে নেয়। সুভাষ ব্রিগেডের

অন্য দুটি দল কোহিমায় প্রবেশ করে কোহিমা জয় করে নেয়। ১৪ এপ্রিল ১৯৪৪ সালে কর্নেল শওকত আলির নেতৃত্বে মণিপুরীদের সাহায্যে ইম্ফলের ৪৫ কিলোমিটার দূরে মৈরং-এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ইম্ফলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। সুভাষ ব্রিগেডের সেনাপতি শাহনাওয়াজ দাবি করেছিলেন যে এই যুদ্ধ অভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতবর্ষের প্রায় ১৫০ মাইল ভিতরে প্রবেশ করেছিল। এই যুদ্ধ অভিযানে একটিও যুদ্ধে তারা পরাজিত হননি। কিন্তু প্রাণ দিতে হয়েছিল প্রায় ৪ হাজার সৈন্যকে। বিমান বাহিনী ও কামানের অভাব, পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধ করার অসুবিধা, খাদ্য ও রসদের অভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ অভিযান থামাতে হয়েছিল।

সবথেকে আশ্চর্য ঘটনা হলো, যে আজাদ হিন্দ সরকারকে পৃথিবীর আঠারোটি শক্তিধর দেশ স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং নেতাজীকে তার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকার করেছিল, সেই আজাদ হিন্দ সরকারকে তৎকালীন স্বাধীন ভারতবর্ষের সরকার স্বীকৃতি দিল না। এমনকী আজাদ হিন্দ ফৌজের কোনো স্মৃতিচিহ্ন রাখতেও তারা উদ্যোগী হলো না। সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের উদ্দেশে ওয়ার মেমোরিয়াল গঠন করা হলো কিন্তু ভারতবর্ষ নেতাজীর ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার পরিবর্তে ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করল। তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার বামপন্থী মানসিকতাসম্পন্ন ঐতিহাসিকদের দিয়ে এমনভাবে ইতিহাস রচনা করালো যাতে নেতাজীর গুরুত্ব ও অবদানকে ইতিহাসের বইয়ে দু' তিনটে পাতায় সীমিত করে দেওয়া হয়। নেতাজীর মৃত্যুকে ঘিরে এমন এক রহস্যের ফাঁদ পাতা হলো যা আজও ভেদ করা সম্ভব হয়নি। সমস্ত তথ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর জীবন ও মৃত্যুকে ঘিরে জঘন্য রাজনীতি করেছে কংগ্রেস। বামপন্থীরা নেতাজীকে তোজোর কুকুর বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি। নেতাজীর স্বার্থশূন্য ব্যক্তিত্বের তেজকে কংগ্রেস এত ভয় পেয়েছিল যে তারা ভেবে নিয়েছিল নেতাজীকে ভারতবর্ষে যদি যথাযোগ্য স্থান দেওয়া হয় তাহলে গান্ধীজী বা জওহরলাল নেহরুর মতো ব্রিটিশদের দয়ার ভিখারিদের দেশের মানুষ ছুঁড়ে ফেলে দেবে। নেতাজীকে গুরুত্ব দিলে গোটা কংগ্রেস নেতৃত্ব গুরুত্বহীন হয়ে যেত। তাই এত বছর ধরে চেষ্টা চলল নেতাজীকে ভুলিয়ে দেওয়ার। ফাইলের পর ফাইল জমা হলো, কমিশনের ওপর কমিশন বসলো কিন্তু নেতাজী কোনো ন্যায় পেলেন না স্বাধীন ভারতবর্ষে।

যদিও বর্তমান ভারত সরকার আজাদ হিন্দ বাহিনী ও নেতাজীকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। ২০১৮ সালের ২১ অক্টোবর আজাদ হিন্দ বাহিনীর গঠনের ৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লির লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ বাহিনীকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং ঘোষণা করেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তার এই উদ্যোগকে ভারতবর্ষের আপামর জনগণ উৎসাহের সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছে। নেতাজীকে ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সম্বোধন করায় অধিকাংশ ভারতবাসীর মনে প্রশ্ন জেগেছে যে যদি সেই সময়কার ১৮টি দেশ আজাদ হিন্দ সরকারকে এবং তার প্রধানমন্ত্রী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে স্বীকৃতি দিতে পারে, তাহলে তাঁর নিজস্ব দেশ ভারতবর্ষ তাঁকে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারে না কেন? পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন কিন্তু ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য যিনি নিজের জীবন দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন তার প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন— তার অবদানকে আগামী প্রজন্মের কাছে জীবিত রাখার জন্য অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু র নাম সরকারিভাবে এবং সাংবিধানকভাবে ঘোষণা করার অনুরোধ আমি বর্তমান সরকারের কাছে রাখছি।

(লেখিকা ইতিহাসের শিক্ষিকা এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)

বাম তাত্ত্বিকদের লেখা থেকে

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন চলছে, সিপিআইয়ের তাত্ত্বিক নেতা এবং দলের ইতিহাস লেখক গঙ্গাধর অধিকারী দলীয় মুখপত্র পিপলস ওয়ার (১৮ জুলাই, ১৯৪৩) পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'হিটলার সুভাষকে তোজোর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তারপর তোজোর সুপারিশেই সুভাষ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির কম্যান্ডার-ইন-চিফ হন। হিটলার তোজো এবং সুভাষের ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার। আমাদের এখন ভ্রাতৃপ্রতিম চীনের স্বার্থে এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিতে হবে।'

২. ওই একই পত্রিকায় ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ তারিখে আর এক সিপিআই তাত্ত্বিক এস জি সরদেশাই লিখেছিলেন, 'কোনও কারণ ছাড়াই আজাদ হিন্দ রেডিয়ো গান্ধীজী এবং সুভাষের মতপার্থক্য নিয়ে গলা ফাটিয়ে চলেছে। মোদ্দা কথাটি হলো, গান্ধীবাদের উদ্দেশ্য দেশকে সুভাষের হাতে তুলে দেওয়া— যে সুভাষ একজন ফাঁসুড়ের থেকে কিছু কম নয়।'

৩. ২৫ জুলাই, ১৯৪৩ পিপলস ওয়ার একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। যার সারমর্ম : 'সম্প্রতি সুভাষ বোস সিঙ্গাপুর রেডিয়ো মারফত একটি মুক্তিবাহিনী গঠন করার কথা ঘোষণা করেছেন। বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েছেন সুভাষ স্বয়ং। এই বাহিনী তৈরি হয়েছে জাপানি মিলিটারিদের সাহায্যে এবং এর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ভারতে প্যারাসুট বাহিনী পাঠানো। যদিও এই বিশ্বাসঘাতকেরা সবাই ভারতীয় এবং দেশীয় পোশাক পরিহিত কিন্তু এদের লক্ষ্য দেশের স্বাধীনতা নয়, দাসত্ব।' অর্থাৎ নেতাজী ভারতকে ব্রিটিশের কবল থেকে মুক্ত করে জাপানের হাতে তুলে দিতে চান।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন কল্পতরু খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারে সনাতনীর স্রোত

বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়

১৮৩৫ সালে ভারতবর্ষে রূপায়িত হলো মেকলে-প্রসূত ও প্রবর্তিত ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা, খ্রিস্টীয়করণের পথে ঔপনিবেশিক ভারত-মানস দখলের পরিকল্পনা। ঠিক পরের বছরই ছন্দপতন! যে হিন্দু মনীষীর জন্ম ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি বিকেল তিনটেয়, তিনিই তাদের প্রথম দিনটি ঐশী সৌন্দর্যে দখল করে নিলেন। তারপর ১৮৮৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর হুগলীর আঁটপুরে এবং ১৮৯২ সালের ২৫ ডিসেম্বর কন্যাকুমারীতে আসবেন স্বামী বিবেকানন্দ, বড়দিনটিকেও একইভাবে অতিক্রম করে যেতে। খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারে সনাতনী সংস্কৃতির স্রোত বইতে থাকবে।

১ জানুয়ারি হলো কাশীপুর উদ্যানবাটীতে এক অবতার পুরুষের কল্পবৃক্ষ হয়ে ওঠার দিন। তাপিত সংসারে নিমজ্জিত মানুষের ইচ্ছে পূরণের দিন। জীবোদ্ধার করে স্বর্গীয় মহিমা বিতরণের দিন। দক্ষিণেশ্বর নাটমন্দিরের জনবহুল সভায় ভৈরবী ব্রাহ্মণী একদিন তাঁকে অবতার রূপে প্রচার করেছিলেন। সেই তিনিই ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু রূপে কলকাতার কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তামসভেদী আলোকের বেশে অবতীর্ণ হলেন। কেমন সে রূপ? 'শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'-তে কবি অক্ষয় কুমার সেন লিখছেন—

"শ্রীঅঙ্গের মধ্যে খোলা বদনমণ্ডল।
কান্তিরূপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল।।
দারুণ বিয়াধি-ভোগে শীর্ণ কলেবর।
কিন্তু বয়ানেতে কান্তি বহে নিরন্তর।।
মনে হয় অঙ্গবাস সব দিয়া খুলি।
নয়ন ভরিয়া দেখি রূপের পুতুলি।।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তখন অসুস্থ। সব নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পোশাকে সর্বাঙ্গ আবৃত হয়ে বাড়ির দোতালা থেকে ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে সঙ্গে নিয়ে নামলেন। ছুটির দিন। তাই উদ্যানবাটীতে অনেক ভক্ত এসেছেন। ঠাকুরের জন্য রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত হয়ে একতলার ঘরে নরেন ও কয়েকজন সেবক তখনও নিদ্রিত। ঠাকুরের ঘরদোর গোছাচ্ছেন সেবক লাটু ও শরৎচন্দ্র। উদ্যানে রয়েছেন গৃহীভক্ত গিরিশ ও রামচন্দ্র। ঠাকুর একাকী বেড়াচ্ছেন সুড়কির রাস্তা ধরে, পুষ্করিণী হয়ে ফটক পর্যন্ত। হঠাৎ গিরিশকে প্রশ্ন করছেন, 'তুমি যে আমার সম্বন্ধে এত বলে বেড়াও, তুমি কী দেখেছ বা বুঝেছ?' তৎক্ষণাৎ বুঝে গেছেন গিরিশ, ঠাকুর আর কী বলতে চাইছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পদতল আশ্রয় করে তিনি প্রত্যুত্তর করলেন, 'ব্যাস বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর সম্বন্ধে বেশি কী আর বলতে পারি।' সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। ঠাকুর ভাবের গভীর সমাধিতে মগ্নচেতন হলেন। মুখমণ্ডলে নির্গত হলো অপরূপ দিব্যপ্রভা। রূপমাধুরী সর্বশরীর থেকে বিনির্গত হতে লাগলো। ভক্তগণ বিমুগ্ধ, অস্ফুট। গিরিশ ঐশী-উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠলেন। বারংবার ঠাকুরের চরণধূলিকণা গ্রহণ করলেন। চীৎকার করে ডাকলেন সবাইকে, 'তোরা কে কোথায় আছিস আয়, আজ শ্রীশ্রীঠাকুর কল্পতরু হয়েছেন এবং সকলকে বর দিচ্ছেন।' ছুটে এলেন সবাই। ভক্তবৃন্দ ভাবোচ্ছ্বাসে উচ্চারণ করলেন 'জয় রামকৃষ্ণ'। বুঝলেন আজ আর অবতারবরিষ্ঠ নিজেকে লুকোবেন না। আজ আর ভগবানের ধরাধামের বার্তা অপ্রকাশিত থাকবে না। স্বয়ং ভগবান আজ 'সব হয়েছেন'। আজ তিনি কল্পতরু, আজ পুরো পৃথিবী রামকৃষ্ণময়। আজ পাপী-তাপী সকলের অভয়পদে আশ্রয় লাভের দিন। ১ জানুয়ারি।

ঠাকুর ক্রমে বাহ্যদশায় ফিরে আসছেন। এবার হাসছেন তিনি। ভক্তের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করে বলছেন, 'চৈতন্য হোক'। সে মধুর বাক্য কেবল সেই বেলাকার নয়, সেই দিনের জন্যও নয়! শাশ্বতকালের চৈতন্যবার্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল ১ জানুয়ারি খ্রিস্টীয় আনন্দের এক দিনে। 'লীলীপ্রসঙ্গ'-এ স্বামী সারদানন্দ লিখছেন, 'স্বার্থগন্ধহীন তাঁহার সেই গভীর আশীর্বাণী প্রত্যেকের অন্তরে প্রবল আঘাত প্রদানপূর্বক আনন্দস্পন্দনে উদ্বেল করিয়া তুলিল। কোনো এক অপূর্ব দেবতা হৃদয়ে অনন্ত যাতনা ও করুণা পোষণপূর্বক বিন্দুমাত্র নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও, মাতার ন্যায় তাহাদিগের স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় প্রদান করিতে ত্রিদিব হইতে সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে সস্নেহে আহ্বান করিতেছেন!' কারো অধ্যাত্মনেত্র গেল খুলে। কারও ভাগ্য। কেউ পেলেন সমাধি লাভের বরমাল্য। কেউ পেলেন অর্থসম্পদ। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো পুষ্পচয়ন করে মন্ত্রোচ্চারণ করে শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করছেন। একে একে তাদের সকলকে আশীর্বাদ দিয়ে ধন্য করলেন পরমপুরুষ। ধন্য হলো সনাতনী হিন্দু-সংস্কৃতি। ইংরেজি বছরের প্রথম দিনটাই ভারতীয় সাধুর কাছে পরাজিত হলো। যতদিন যাবে সমগ্র বিশ্বই কল্পতরু বৃক্ষের ফললাভ করবে। সুবাস ছড়াবে হিন্দুধর্মের।

(লেখক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সম্পর্ক প্রমুখ)

পশ্চিম রাঢ়বাঙ্গলার লোকায়ত উৎসব

টুসু পরব

অনিল বরণ মণ্ডল

টুসু পরব। নামে কী বা আসে যায়। কিন্তু পশ্চিম-রাঢ়বঙ্গে টুসু পরব নামটাই সমধিক পরিচিত। এ পরব পৌষ সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হয়। তাই একে পৌষ পরবও বলা হয়। আবার এদিন সূর্য মকর ক্রান্তি থেকে কর্কট ক্রান্তিতে যায়, তাই একে মকর সংক্রান্তি বা মকর পরবও বলা হয়। তবে পশ্চিম রাঢ়বঙ্গে টুসু পরব নামটা যেভাবে প্রচারিত অন্য সব নাম পিছু হঠতে বাধ্য।

টুসু কে বা টুসু কোথা থেকে এল এসব বিচার করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনোটাই আমার নেই। কিন্তু পশ্চিম-রাঢ় বাঙ্গলায় এই টুসু পরবের যে উন্মাদনা তা দুর্গা পূজাতেও থাকে না। শরৎকালে দুর্গা পূজা হয়। গ্রামেগঞ্জের মানুষের তখন হাত খালি। খাবার জোটাতেই তারা হিমসিম খায়। তাই দুর্গা পূজা তাদের কাছে পূজা হিসেবে গণ্য হয় বটে, কিন্তু তা পরব হয়ে ওঠে না। কিন্তু পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে টুসু পরব। গ্রামের চাষির ঘরে তখন গোলা ভর্তি ধান। আবার যে মজুর চাষের কাজে গায়েগতরে খাটে সেও মজুরি হিসেবে ধান ও টাকা পয়সা ঘরে আনে। পরব করার মতো সামর্থ্য তখন তাদেরও থাকে। তাই পৌষ মাসের টুসু পরবে রাঢ় বাঙ্গলার বিশেষ করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষ প্রাণের আনন্দে অংশ নেন। নদীর ধারে ধারে কত যে মেলা বসে এই দিনে তার হিসাব নেই। কচিকাঁচারা মা-বাবা, দাদু-দিদাদের হাত ধরে মেলায় যায়। সবার গায়ে নতুন বস্ত্র। লাল নীল হলুদের যেন মেলা বসে যায়। রাস্তায় জনস্রোত চলতে থাকে। সবাই মেলায় যায়। মেলায় ভাভরা, জিলিপি, লাড্ডু, বাদাম ভাজা, ছোলা ভাজা, ছোটো বড়ো নানা রকমের নানা রঙের বেলুন, বাঁশি, হরেক রকমের খেলনা, গৃহস্থালির সরঞ্জাম কী থাকে না। অবশ্যই থাকে টুসু গান।

এদিন ভোরবেলা বাড়ির ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বড়োরা নিকটস্থ নদী, পুকুর বা জোড়ে (ছোটো নদী বা ঝরনা) স্নান করতে চায়। সেখানে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করে রাখা হয় আগে থেকেই। ঠিক যখন সূর্য তার লাল সোনার আভা নিয়ে উদিত হয়, তখনই ছোটো ছোটো ছেলেরা জলে ঝপাং ঝপাং করে ঝাঁপ দেয়। বড়োরা

চপচপে করে তেল মেখে ধীরেসুস্থে ডুব দেন। স্নান সেরে নতুন জামা-কাপড় পরে আগুনের সামনে এসে গা গরম করে নেয় সকলেই। বাড়ির বড়োরা স্নান করে ঘটি ভরে জল নিয়ে আসেন। একে বলা হয় মকর গঙ্গাজল। এই জল ধানের পালুই, মরাই, গোয়াল ঘর প্রভৃতি জায়গায় ছিটানো হয়। তাঁদের ধারণা এই জল গঙ্গা জলের ন্যায় পবিত্র। তাই এর নাম মকর গঙ্গাজল।

এতো গেল একদিক। অন্যদিকে টুসুকে নিয়ে বাড়ির মা-মেয়েরা টুসু পূজায় মেতে ওঠে। পয়লা পৌষ খুব ভোরবেলা উঠে তুলসী মঞ্চের গোড়ায় একটা ছোটো গোলাকার গর্ত করা হয়। এই গর্তের ভিতর এবং বাহির ভালো ভাবে কাদামাটি দিয়ে নিকানো হয়। পরে কাদামাটি দিয়ে গর্তের চারদিক গোল করে ছোটো পাড় দেওয়া হয়। তার উপর কুঁচবীজ দিয়ে সাজানো হয়। কুঁচবীজ ছোটো কিন্তু দু' রঙের হয়। লাল, বাদামি, কালো, সাদা এইসব রং থাকে। এইসব রং দিয়ে কাদামাটির উপর নানা রকমের ফুল, লতাপাতা আঁকা হয়। কোথাও আবার মাটির ছোট্ট খলার উপর নানা রকমের ফুল, কুঁচবীজ প্রভৃতি দিয়ে টুসু পাতানো হয়। পয়লা পৌষ টুসুর প্রতিষ্ঠা, একেই বলে টুসু পাতানো। পশ্চিম- মেদিনীপুরে মাটির টুসুর পুতুল পাওয়া যায়। পুতুলকে ফুলমালা দিয়ে সাজানো হয়। পুরুলিয়ায় টুসুর বড়ো বড়ো চৌডল করা হয়। নানা রঙের কাগজ, ফুল দিয়ে চৌডল সাজানো হয়। টুসু পূজার জন্য ফুল জরুরি। শীতের নানা রকমের ফুল বিশেষ করে বাহারি গাঁদা টুসু পূজার প্রধান ফুল। টুসু পূজায় মন্ত্র নেই, গান আছে। টুসু জাগানোতে গান, ঘুম পাড়ানোতে গান। ফুল তুলতে যাবার সময়ও গান—

'টুসুকে আনিতে যাব চন্দন কাঠের চৌডলে
যদি টুসু দয়া করে রাখব সোনার মন্দিরে।'

এরপর প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা মেয়েরা টুসুর সামনে একসঙ্গে বসে গান গেয়ে টুসুর পূজা করে। এই পূজায় ধুপ ধুনো বা কোনো সুগন্ধি ব্যবহার হয় না। দরকার হয় না বামুন পুরুত। পূজার শেষে ঘরের দুধ, দই, চিড়ে, গুড় কিংবা ছোলা ভাজা, চালভাজা দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। শেষে ভালোভাবে টুসুকে ঢাকা দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয় গানের মাধ্যমেই—

‘ঘুমো ঘুমো ঘুমো টুসু এই সন্ধ্যেবেলা,
তোমাকে ওঠাব সেই সক্কালবেলা।’

আবার সকালবেলায় দু’চারজন এসে টুসুর ঘুম ভাঙায়—

‘বেলা করে ঝিকিমিকি রতন কেন উঠ না,
উঠ রতন চেতন করে আমায় জ্বালা দিও না।’

দক্ষিণ বাঁকুড়ায় এভাবে ১০/১৫ দিন চলার পর স্থানীয় হাট থেকে টুসুর চৌডল আনা হয়। সন্ধ্যেবেলা তুলসী মঞ্চের সামনে তা রাখা হয়। গানে গানে সন্ধ্যা মুখরিত হয়। এই সময় মেয়েদের সঙ্গে বাড়ির মায়েরাও গানে গলা মেলান।

টুসু গানের নানান ধরন। যখন মা-মেয়েরা একসঙ্গে গান করে তখন গানে পৌরাণিক কাহিনি আসে। আবার যখন মায়েরা থাকেন না তখন মেয়েদের মনের কথা গানে চলে আসে। কম বয়সে মেয়ে বিয়ে করতে চায় না। কিন্তু বাবা সম্বন্ধ পাকা করে ফেলেছেন। মেয়ের মন এখন বিয়ে করতে চায় না। সেই মনের কথা এল টুসু গানে—

‘ছোটোবেলায় বিহা দিবি পড়ে রইবেক খেলাশান
এই খেলাশান দেখে মাগো হিজুরবি গো চিরকাল।’ (হিজুরবি— ফুঁপিয়ে কান্না)।

টুসু গান ও টুসু পরবে মেয়েদেরই প্রাধান্য। মেয়েদের অর্ধেক আকাশ এদিন যেন পূর্ণ হয়ে ওঠে। হাসিতে, খুশিতে, রঙিন বাহারি শাড়ির সাজগোজে মেলায় গিয়ে টুসু গানের রঙ্গ রসিকতায় এক দিনের জন্য হলেও তারা যেন দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত তুচ্ছতা এবং একঘেয়েমি মলিনতা দূর করে দেয়। গানে গানে ভুলে যায় সবকিছু।

টুসু গান অনেক আছে। সে বিষয়ে আলোচনা অনেকে করেছেন। আমি সে বিষয়ে যেতে চাই না। বাঁকুড়া পুরুলিয়া পশ্চিম মেদিনীপুরের টুসু পরব কেন্দ্রিক গ্রামীণ জীবনের মাতোয়ারা রূপের কথাই কিছুটা বলব। পৌষমাস যত শেষের দিকে যায় এই তিন জেলার গ্রামীণ জীবন তত জমে ওঠে। গ্রামীণ হাট-বাজার জমে ওঠে। কেনাকাটার যেন ধুম পড়ে যায়। বাড়ির সবার জন্য চাই নতুন জামা কাপড়। বাড়ির যদি কাজের লোক থাকে তাদেরও দিতে হবে নতুন কাপড়। মকর স্নান করে এসে পুরনো কাপড় পরতে নেই। শুধু কি নতুন কাপড় হলেই চলবে? দরকার নানারকম খাদ্য-পানীয়। চাই আতপ চাল, দানাগুড়ি চাল, নলেন গুড়, আখের গুড়, তিল, তেল, পাটালি, দুধ, খোয়া, মাখন আরও কত কী। ভোরবেলা স্নানের পর নতুন কাপড় পরে রৌদ্রে বসে পিঠে খাওয়া, তারপর দলে দলে মেলা দেখতে যাওয়া।

পৌষমাস সাধারণত ২৯ দিনের হয়। ২৯ পৌষ মকর সংক্রান্তি। ২৭ পৌষ চাঁউড়ি, ২৮ পৌষ বাঁউড়ি। এলাকা অনুযায়ী চাঁউড়ি দিনকে বলা হয় ‘গুঁড়িকুটা’। সেদিন প্রতি বাড়িতে সকাল থেকে ঢেঁকির শব্দ। এই দিন থেকেই টুসু নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে মা মেয়েরা গ্রামের পথে ঘুরে বেড়ায়। একে বলা হয় ‘টুসু বুলানো’। প্রতিবেশীর ঘরে গিয়ে তারা জানান দেয়—

‘তোদের ঘরকে টুসু আইল
বাহির হও গো সবাই মিলে,
এইবার টুসু চলে যাবেক
তখন থাকবি সবাই একা ঘরে।’

পড়শিরা এই টুসু বুলানোর দলকে চাল ও পয়সা দেয়। তা থেকেই ওদের মেলা দেখার খরচ উঠে আসে।

বাঁউড়ির দিন পিঠে করার কাজ। এ কাজ শ্রমসাধ্য। মেয়েদের সারাদিন লেগে থাকতে হয়। পিঠের কাজ শেষ করতে রাত হয়ে যায় অনেক। এদিনই টুসুর জাগরণ। সেদিন মেয়েরা নিজেরা চাঁদা তুলে চা খাবার ব্যবস্থা করে সারা রাত্রি ধরে। সারা রাত টুসুর গান চলে।

ভোর হতেই গান গাইতে গাইতে টুসুর বিসর্জন ঠাণ্ডা কনকনে নদীর জলে। যেখানে বিসর্জন সেখানেই মেলা। মকর পরবের দিন এই তিন জেলায় যে কত মেলা বসে তার কোনো হিসাব নেই। কিছু হঠাৎ নতুন মেলাও বসে যায়। প্রধানত নদীর চরেই মেলা বসে। পুরুলিয়ায় টুসু মেলা যেন আরও বেশি জমে। এইদিন এ জেলার রূপই বদলে যায়। বড়ো বড়ো টুসুর চৌডল নিয়ে রঙিন শাড়ি পরে গান গাইতে গাইতে, হাসি-মস্করা করতে করতে মেয়েরা পথ ঘাট থেকে টুসুর মেলা সব জমিয়ে তোলে। সুবর্ণরেখা নদীর পাড়ে তুলিনের টুসু মেলা, পুরুলিয়া শহরের নিকটে কাঁসাই নদীর চরের মেলা, দুয়ারসিনির মেলা, বড়গ্রামের নিকট শিলাবতী নদীর মেলা এগুলি হলো এ জেলার বড়ো বড়ো মেলা। ছোটো মেলা অনেক আছে। বাঁকুড়ার খাতড়া থানার পরকুলের মেলা, মুকুটমণিপুরের মেলা, ইন্দপুর থানার মাকড়ার মেলা হলো এ জেলার বিখ্যাত টুসু মেলা। এই মেলাগুলিতে গৃহস্থালির জিনিসপত্র প্রচুর পাওয়া যায়। সারা বছরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নিতে অনেকেই মেলায় যান। লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় হয় মেলাগুলিতে। ফলে টুসু পরব, টুসু মেলা, টুসু কেন্দ্রিক পশ্চিম রাঢ়ের লোকায়ত জীবন বর্ণময় হয়ে ওঠে মকর- সংক্রান্তির পুণ্য দিনে।

মকর সংক্রান্তির পরের দিন অর্থাৎ ১ মাঘ হলো আখ্যান যাত্রা। এদিনটি যে কোনো কাজের জন্যই শুভ দিন। পশ্চিম রাঢ় বাঙ্গলায় সমস্ত গ্রামদেবতার পূজা হয় এদিন। গ্রামের প্রান্তে কোনো গাছের তলায় এই গ্রাম দেবতাদের বাস। বিভিন্ন রকম তাঁদের নাম। পুরুলিয়ায় এঁরা বেশি পরিচিত সিনি ঠাকুর নামে। বাঁকুড়াতেও সিনি ঠাকুর আছেন। যেমন রানিবান্ধের বামনিসিনি। এখানে এই দিন থেকে তিন দিনের হরিনাম সংকীর্তনের আসরও বসে। এছাড়া কুলাই, মুগলি, বাসলি, ভানসিং, গরামঠাকুর, বুরু ঠাকুর, বনভৈরবী গ্রাম দেবতার বহু নাম। গ্রামদেবতার পূজায় মাটির ঘোড়া হলো প্রধান উপাচার। জল ছাড়া দুধের পায়েস হয় মাটির থালায় ও শুকনো কাঠের জ্বালে। সে পায়েসের স্বাদ অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। এছাড়া অনেক জায়গায় হাঁস, মুরগি বলিও দেওয়া হয়। পিঠে খাওয়ার পর গরম গরম মাংসের ঝোল আর ভাত খেয়ে পরব-ক্লান্ত পশ্চিম রাঢ়ে লোকজীবন বিকেলের নরম রোদে নতুন কোনো মজলিসে বসে।

(লেখক ভারত সরকারের আয়কর বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক)

বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি

কৃষ্ণা গুহ রায়

নির্জন রাত। শান্ত প্রকৃতি। বাসুলি দেবীর মন্দিরের পূজারি চণ্ডীদাস এক মনে কৃষ্ণের ভজন গেয়ে চলেছেন। গ্রামের কিছু মানুষ তন্ময় হয়ে সেই গান শুনছেন। উদাস প্রকৃতির মানুষ এই চণ্ডীদাস। সংসারী হওয়ার কোনও বাসনা নেই। ছেলেবেলা থেকেই দেবতার প্রতি অসীম ভক্তি এবং ঐশ্বর্য বলতে পদ রচনা ও তাতে সুর দিয়ে কণ্ঠের মায়াজাল সৃষ্টি করা। যে একবার তাঁর গান শোনে সেই মুগ্ধ হয়ে যায়। রাত ক্রমশ বাড়তে থাকে। চণ্ডীদাস গানের মধ্যে একাত্ম হয়ে পড়েন। হঠাৎ নারীকণ্ঠের চাপা কান্নার শব্দে চণ্ডীদাসের মনঃসংযোগ ছিন্ন হলো। একজন বৃদ্ধ গ্রামবাসী বলে উঠলেন, থামলে কেন? চণ্ডীদাস ইশারায় ব্যাপারটা বোঝালেন। —ওই তো রামমণি কাঁদছে। আজও বোধহয় কোথাও খাবার জোটেনি।

চণ্ডীদাসের মনটা ব্যথায় ভরে উঠল। সকলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, আমরা গ্রামের এতগুলো মানুষ থাকতে একটা মানুষ এ রকম উপোস করে থাকবে। আমরা কী ওর জন্য কোনও ব্যবস্থাই করতে পারব না? সবাই বললে, ও তো ধোপানি। নীচু জাত। বৃদ্ধ বললেন, আচ্ছা, ওকে যদি মন্দির পরিষ্কারের কাজে রাখা যায় তবে কেমন হয়? সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, তবে তো খুব ভালো হয়। চণ্ডীদাস খুব খুশি হলেন। মনে মনে বললেন, ভালোই হলো। সারাদিন মায়ের সেবা করবেন আর মায়ের ভোগে রামীর ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে।

পরদিন প্রত্যুষে সূর্য উদয় হওয়া মাত্র রামমণি বা রামী মন্দিরে এসে উপস্থিত হলো। চণ্ডীদাস তখন সবেমাত্র মন্দিরের দরজা খুলেছেন। রামীকে দেখে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। যুবক চণ্ডীদাসকে দেখে লজ্জায় চতুর্দশী রামীর মুখ রক্তিম হয়ে উঠল।

চণ্ডীদাস বললেন, আজ থেকে তুমি মন্দিরের সব কাজকর্ম করবে। মন্দির চত্বর এমন ভাবে পরিষ্কার রাখবে, যেন সেখানে বিন্দুমাত্র ধুলো না জমে। ভোগান্ন গ্রহণ করবে। এখানে তোমার আহারের কোনও অভাব হবে না। মায়ের কাছে সব সন্তানই সমান। মা তাঁর কোনও সন্তানের কষ্ট দেখতে পারেন না। মা আমার বরাভয় দাত্রী। চণ্ডীদাসের এমন কোমল ব্যবহারে রামীর অন্তর খুশিতে ভরে উঠল। রামী মন্দির পরিচর্যার কাজে লেগে পড়ল। ধীরে ধীরে এ ভাবে সময় অতিক্রান্ত হতে থাকল। রামমণি এখন অষ্টাদশী। বাসুলি দেবীর কৃপায় রামীর এখন অন্ন-বস্ত্রের অভাব ঘুচেছে। রামীর কাজে গ্রামের সকলেই খুব সন্তুষ্ট। তার কর্মদক্ষতা তাকে সকলের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। চণ্ডীদাস মায়ের সেবা করেন আর অবসর সময়ে পদ রচনা করেন। চণ্ডীদাসের সান্নিধ্যে রামীও তত দিনে পদ রচনা করতে শিখে গেছে।

তুমি যে আমার আমি যে তোমার/সুহৃদ কে আছে আর / খেদে রামী কয়/প্রাণনাথ বিনা জগৎ দেখি আঁধার।'

কিন্তু ততদিনে পারস্পরিক সুর আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে রামীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের কাম গন্ধহীন প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। সমাজ তাদের এই প্রেমকে সুনজরে দেখল না। তাদের প্রেম কলঙ্কময়— এই আখ্যা দিয়ে তাদের সমাজচ্যুত করল। কলঙ্কিতা রামী ওই মন্দির থেকে বিতারিত হয়ে চণ্ডীদাসকে জানালেন, 'কি কহিব ও বধূ হে বলিতে না ফুরায়, কাঁদিয়া কহিতে পোড়া মুখে হাসি পায়। অনামুখো মিন সেগুলোর কিবা বুকের পাটা, দেবী পূজা বন্ধ করে কূলে দেয় কাটা দুঃখের কথা কইতে গেলে প্রাণ কাঁদে উঠে, মুখ ফোটে না বলতে পারি মরি বুক ফেটে।'

এরপরে চণ্ডীদাস গ্রাম ছেড়ে রামীকে সঙ্গে নিয়ে গৌড়ের পথে রওনা দেন। গৌড়ের নবাব চণ্ডীদাসকে রাজসভায় গান গাইবার অনুরোধ করেন। চিকের আড়ালে বসে চণ্ডীদাসের গান শুনে বেগম চণ্ডীদাসের গুণমুগ্ধ হয়ে তাঁর অনুরাগিণী হয়ে পড়েন। নবাবের কাছে এসে সেকথা স্বীকার করতে তাঁর কোনও রকম কুণ্ঠাবোধও হয় না। নবাব সেকথা শুনে প্রচণ্ড রেগে ওঠেন। তখন তিনি আদেশ দেন হাতির পিঠে চণ্ডীদাসকে বেঁধে কশাঘাত করার। এই নিদারুণ কশাঘাতে চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়।

রামীর পদাবলী রচনার মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যকাশে প্রথম মহিলা কবির আবির্ভাব ঘটে। ◻

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

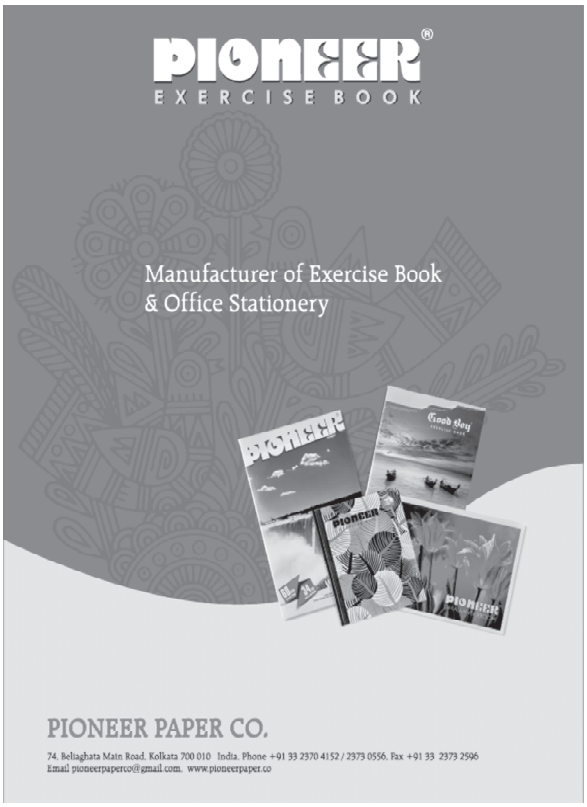

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

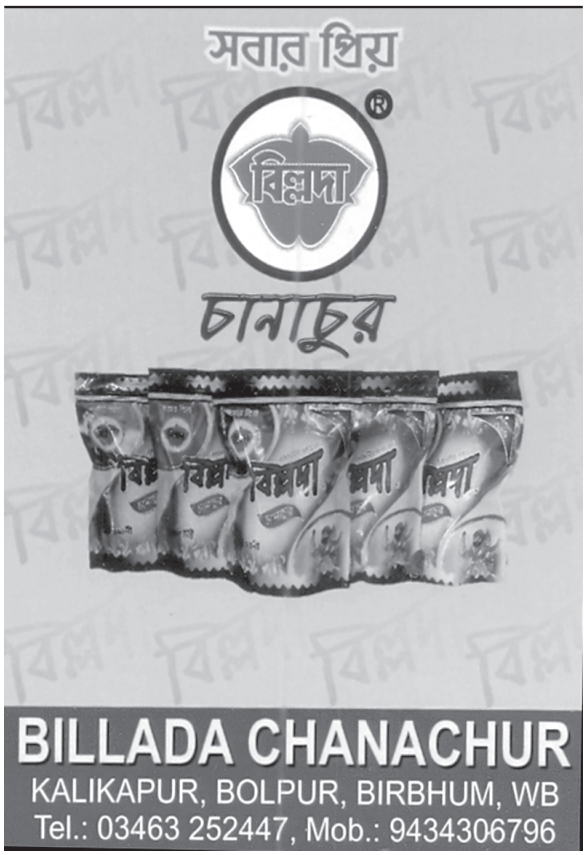

কৃষক আন্দোলন পশ্চিবঙ্গের স্বার্থের পরিপন্থী

দীপ্তাস্য যশ

পঞ্জাব ও হরিয়ানার 'চাষিরা' কৃষক আন্দোলন করছে। কীসের স্বার্থে? কৃষকদের স্বার্থে? এই কৃষকরা কারা? এই আন্দোলনে কি বাঙ্গলার কৃষকদের স্বার্থও রক্ষিত হবে? নাকি পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে পঞ্জাব, হরিয়ানার এইসব জোতদার, জমিদারদের স্বার্থরক্ষা হবে এই আন্দোলনে? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে কয়েকটি বিষয় একটু আলোচনা করা যাক। সেই আলোচনা থেকেই উত্তরটি উঠে আসবে।

প্রথমত নতুন যে কৃষি বিল সংসদে পাশ হয়েছে তার মূল কথাগুলি একটু দেখে নেওয়া যাক : এই পরিবর্তনের ফলে কৃষক তার ফসল বিক্রির জন্য এপিএমসি মান্ডি ছাড়াও খোলা বাজারে ফসল বিক্রির সুবিধা পাবে। তার জন্য কৃষককে কোনো ট্যাক্স বা সেস দিতে হবে না।

এপিএমসি বন্ধ হবে না, কিন্তু তাকে খোলা বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে। ঠিক যেমন ব্যাঙ্ক, ইন্সুরেন্স বা টেলিকমের ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে সরকারি সংস্থাগুলিকে প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে অবতীর্ণ হতে হয়েছে।

এই আইনের কারণে সরকার, নির্ধারিত এমএসপি ব্যবস্থা বন্ধ হবে না। তা চালু থাকবে। এই পরিবর্তনের ফলে চাষি সরাসরি কর্পোরেট সংস্থা বা এক্সপোর্টারকে নিজের ফসল বিক্রি করতে পারবে বা তাদের সঙ্গে চুক্তি করতে পারবে। এমনকী নিজ রাজ্যের বাইরে ও চাষি সরাসরি ফসল বিক্রি করতে পারবে।

এই হলো মূল কথা। অর্থাৎ এই আইনের ফলে একদিকে যেমন চাষির সরাসরি রিটেল সার্ভিস প্রোভাইডার বা খুচরো বিক্রেতার সঙ্গে সরাসরি চুক্তির রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে তেমনই মজুতদারি আইনে ছাড়ের ফলে কৃষিভিত্তিক পরিকাঠামো ব্যবস্থায় বেসরকারি লগ্নিও আহ্বান করা হয়েছে।

এবার যে বিষয়টি উঠে আসছে তা

ফঃ ৫

হলো, এই যে আইন কেন্দ্রীয় সরকার চালু করল তা কি একেবারেই নতুন এবং অপ্রত্যাশিত? তা একেবারেই নয়। কারণ চুক্তি চাষের সুবিধার জন্য অনেক রাজ্যই ইতিমধ্যে কৃষি আইনে পরিবর্তন এনেছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৪ সালে কৃষি আইনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনে। এর ফলে একদিকে যেমন কৃষক সরাসরি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করার ক্ষমতা পায়, তেমনই বিভিন্ন সংস্থা তারা সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ফসল কিনে তা বাজারে বিক্রয় করতে পারে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশের জন্য যে আইন এখন প্রযোজ্য করল তা ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে চালু আছে।

এবার আসি পঞ্জাবের কথায়। পঞ্জাব সরকার তাদের প্রকাশিত তথ্যে জানাচ্ছে শুধু ২০০৭-২০০৮ সালেই সে রাজ্যে চুক্তি চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ ৯৫,৩১২ হেক্টর। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গেরও আগে পঞ্জাবে এই চুক্তি চাষ চালু হয়েছে।

চুক্তি চাষের এই তথ্যটি তুলে ধরার কারণ হলো, বারান্দায় টবে আলুর চাষ করা যে সব বামবন্ধুরা আমাদের প্রতিনিয়ত সাবধান করছেন যে চুক্তি চাষ চাষির জন্য এক ভয়ংকর ব্যবস্থা, এর ফলে নীল চাষের প্রত্যাবর্তন ঘটবে— সেই সব বন্ধুদের একটু আশ্বস্ত করা। তাদের জানানো যে চুক্তি চাষ এই দেশে এবং আমাদের রাজ্যে এমনকী পঞ্জাবেও বহু আগে থেকে চালু আছে, সেখানে এখনও নীল চাষ চালু হয়নি। বরং চাষিরা ক্রমশ চুক্তি চাষেই আগ্রহী হচ্ছে। এর মূল কারণ ফসলের দামের নিশ্চয়তা। একটু উদাহরণ দিই তাহলেই বোঝা যাবে।

২০১৮-১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে আলু উৎপাদন হয়েছিল মোটামুটি ৯০-৯২ লক্ষ মেট্রিক টন। সর্বোচ্চ দাম পাওয়া গেছিল জ্যোতি আলুর ক্ষেত্রে মোটামুটি ৯০০ টাকা বস্তা। চন্দ্রমুখীর ক্ষেত্রে প্রায় ১১০০ টাকা। তাও এই দাম তারা পেয়েছেন যারা কোল্ডস্টোরেজে সাত মাস রাখতে পেরেছেন অর্থাৎ সেই আর্থিক সামর্থ্য যে চাষিদের ছিল। যারা পারেননি তারা মাঠ থেকেই জ্যোতি আলু বেচেছিলেন মোটামুটি ২৬০ টাকা বস্তা হিসেবে। এক বস্তায় মোটামুটি ৫০ কিলো আলু থাকে।

২০১৯-২০২০ সালে আলু চাষ হয়েছে আরও কম। প্রায় ৯০ লক্ষ টন। কিন্তু এবারে মাঠ থেকে জ্যোতি আলুর দাম পাওয়া গেছে প্রায় ৫৬০ টাকা এবং কোল্ডস্টোরেজ থেকে বার করার সময় সর্বোচ্চ দাম পাওয়া গেছে ১৫০০ টাকা মতো। সেই আলুর বাজারে ৫৪-৫০ টাকাতেও বিকিয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে দুই বছরেই ১১০ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার থেকে অনেক কম উৎপাদন হলেও একবার চাষি দাম পেয়েছে, আরেকবার পায়নি। এই অনিশ্চয়তার কারণেই চাষিরা ক্রমশ চুক্তি চাষের দিকে ঝুঁকছে।

পশ্চিমবঙ্গে এখন জ্যোতি ও চন্দ্রমুখী আলুর পাশাপাশিই প্রচুর পরিমাণে চাষ হচ্ছে পেপসি আলু। এই আলু পেপসি কোম্পানি বরাত দিয়ে চাষ করায় তাদের পটেটো চিপসের জন্য। বীজ তারাই দেয়, চাষ হয়ে গেলে নির্ধারিত দামে ফসল কিনে নেয়। এক্ষেত্রে চাষিরও সুবিধা। কারণ চাষির কাছে দামের নিশ্চয়তা থাকে। একটা পুরনো হিসাব দেখলেই আন্দাজ পাওয়া যাবে কীভাবে পেপসি আলুর চাষ পশ্চিমবঙ্গে বাড়ছে। ২০০৮-০৯ সালে যেখানে প্রায় ১১ হাজার টন পেপসি আলুর চাষ হয়েছিল, ২০১০-১১ সালে সেখানে প্রায় ২২০০০ টন পেপসি আলুর চাষ হয়। 'চুক্তি চাষের বিরোধী' বামেদের বোঝার সুবিধার জন্য বাম আমলেরই হিসাব দিলাম। বর্তমানে প্রায় ১১০০০ চাষি ৯৫০০ একর জমিতে পেপসি আলুর চাষ করেন। হিসাব মেলালে দেখা যাচ্ছে জ্যোতি আলুতে যদি চাষি প্রতি বিঘায় ৪০০০- ৫০০০ টাকা লাভ করে, পেপসি আলুতে প্রায় ১৭০০০ টাকা লাভ প্রতি বিঘায়। সেই সঙ্গে নূন্যতম মূল্যের নিশ্চয়তা তো রয়েইছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে চুক্তি চাষ অতোটাও খারাপ নয় বা চাষিদের কাছে অতোটাও অপছন্দের নয় যেমনটা বামেরা বলে বরং চুক্তি চাষের জেরে চাষি লাভবানই হচ্ছে। এই চাষিদের জমির মালিকও পেপসি কোম্পানি হয়ে যায়নি এখনও। এখন আবার শুনছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি কেন্দ্রের কৃষি আইনের বিরোধিতা করে বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করাতে চাইছে। জানার ইচ্ছা রইল এক্ষেত্রে কী পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের ২০১৪ সালে করা পরিবর্তনেরও বিরোধিতা করবে বা চুক্তি চাষ বন্ধ করতে চাইবে? এই আলোচনা থেকে খুব পরিষ্কার ভাবেই দেখা যাচ্ছে কৃষি আইনের মূল বিরোধিতার জায়গাটি চুক্তি চাষ নয়। চুক্তি চাষ দেশে বহু আগে থেকেই চালু আছে এমনকী সেই চাষের পরিমাণ দিনে দিনে বাড়ছেও। চাষি লাভবান হওয়ার কারণেই এই পরিমাণ বাড়ছে। চাষি ক্ষতিগ্রস্ত হলে নিশ্চয় চুক্তি চাষে আগ্রহী হতো না। তাহলে মূল বিরোধিতার জায়গা কোনটি?

দেখ যাচ্ছে কৃষক আন্দোলনের যেসব নেতা আছেন তারা যা বলছেন তার মূল বিষয়, এপিএমসি আইন এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্য। এই দুটি জায়গা নিয়েই এদের চিন্তা। কেন এই দুটি বিষয় নিয়ে এদের এতো চিন্তা এবং এই দুটি বিষয় কীভাবে একে অপরের সঙ্গে জড়িত তাও একটু দেখে নেওয়া যাক। অবশ্য এই আলোচনায় বামেদের টানব না। কারণ বামশাসিত কেরলেই এপিএমসি আইন নেই। কাজেই এই নিয়ে ওদের সমালোচনা করার কোনো জায়গাও নেই।

এপিএমসি নিয়ে অন্য কিছু বলার আগে কিছু তথ্য দেখে নেওয়া যাক। কেন্দ্রীয় আইনে বলা হয়েছে কোনো রাজ্য এপিএমসি আইনের আওতায় চাষিদের কাছ থেকে কোনো ট্যাক্স বা সেস নিতে পারবে না। পঞ্জাবে এই ট্যাক্সের পরিমাণ ৮.৫ শতাংশ। বিভিন্ন মান্ডি থেকে এই বাবদ পঞ্জাব সরকারের ২০১৯-২০২০ সালে আয় প্রায় ৩৬০০ কোটি টাকা। এছাড়াও ফুড কর্পোরেশান অব ইন্ডিয়া পঞ্জাব থেকে যে ফসল কেনে তার জন্য লাইসেন্সড এজেন্টদের ২.৫ শতাংশ কমিশান দেয়। পঞ্জাবের প্রায় ৩৬০০০ কমিশান্ড এজেন্ট এবাবদ প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা আয় করেন।

কেন্দ্র সরকারের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে এফসিআই ২০১৯-২০২০ সালে পঞ্জাব থেকে প্রায় ১০৮.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কিনেছে। সে তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে

কেনা হয়েছে মাত্র ১৮.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন। অন্ধ্র থেকে কেনা হয়েছে ৫৫.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন। তেলেঙ্গানা থেকে কেনা হয়েছে ৭৪.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও উত্তর প্রদেশ থেকে ৩৭.৯০ মেট্রিক টন। অর্থাৎ সবথেকে বেশি ধান কেনা হয়েছে পঞ্জাব থেকে। অথচ উৎপাদনের দিক থেকে দেখলে দেখা যাচ্ছে সারা ভারতে যত ধান উৎপাদন হয় পঞ্জাব তার ১১ শতাংশই উৎপাদন করে। সবথেকে বেশি উৎপাদন করে পশ্চিমবঙ্গ। ভারতের মোট উৎপাদনের ১৩.৭৯ শতাংশ। অর্থাৎ এফসিআই যখন ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কিনছে তখন সবথেকে বেশি কেনা হচ্ছে পঞ্জাব থেকে। এফসিআই-এর সঙ্গে যদি অন্যান্য সরকারি এজেন্সিগুলোর ক্রয় পরিমাণ যোগ করা হয় তাহলে দেখা যাবে পঞ্জাব থেকে ধান কেনা হচ্ছে ১৬২.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন। সে তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে সব এজেন্সি মিলিয়ে ক্রয়ের পরিমাণ মাত্র ২৭.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন। অর্থাৎ ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের সবথেকে বেশি সুবিধা পাচ্ছে পঞ্জাব। এমনকী গত বছর দেখা গেছে পঞ্জাবে যা ধান উৎপাদন হয়েছে তার থেকে বেশি এপিএমসিতে বিক্রি হয়েছে। এই বাড়তি ধানের পুরোটাই গেছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে। যেখানে ছোটো কৃষকের সংখ্যা বেশি। যেখানে মান্ডি ব্যবস্থা দুর্বল। যেখানে কৃষকের ফসল মজুত করার ক্ষমতা নেই।

এখন প্রশ্ন হলো পঞ্জাবের কৃষকরা যদি সারা দেশের কৃষকদের স্বার্থে আন্দোলন করেন তাহলে তারা কী মেনে নেবেন যে উৎপাদনের অনুপাত অনুযায়ীই বিভিন্ন সরকারি এজেন্সির ক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারণ হবে সেই রাজ্য থেকে। অর্থাৎ পঞ্জাব যদি সবথেকে বেশি গম উৎপাদন করে তাহলে এফসিআই সবথেকে বেশি গম কিনবে পঞ্জাব থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গ যদি সবথেকে বেশি ধান উৎপাদন করে তাহলে এফসিআই সবথেকে বেশি ধান কিনবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। আন্দোলনের নেতারা এই প্রস্তাবে রাজি হবেন? যদি হন সেক্ষেত্রে না হয় এপিএমসি নিয়ে কেন্দ্র তার অবস্থান বদলাক এমনটা আমরাও চাইব। তবে মনে হয় না এমন প্রস্তাব তথাকথিত কৃষক আন্দোলনের নেতারা শুনতে চাইবেন। অগত্যা এই আন্দোলনে তাহলে লাভ তাদেরই, ষোল আনার উপরে আঠারো আনা। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের কোনো স্বার্থই এতে রক্ষিত হচ্ছে না। এই আন্দোলন একেবারেই পঞ্জাবের বড়ো কৃষক আর কমিশান্ড এজেন্টদের স্বার্থের আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের কোনো স্বার্থই এতে রক্ষা হচ্ছে না।

তবে এই আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদেরও ভূমিকা আছে। আন্দোলনের টাকার জোগান তারাই দিচ্ছে। কীভাবে? পশ্চিমবঙ্গে যে আলু চাষ হয় সেই আলুর বীজ আসে পঞ্জাব থেকে। এমনিতে অন্যান্য বছর যেখানে আলুর বীজের দাম থাকে ১৬০০ থেকে ১৮০০ টাকা প্যাকেট। এবছর সেই বীজের দাম ৪৫০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা প্যাকেট। অর্থাৎ এই আন্দোলনের জন্য যে বাড়তি টাকার প্রয়োজন ছিল তার জোগান দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ছোটো ছোটো চাষিরা।

মুশকিল হলো বাঙ্গালি এমনিতেই বিশ্ব মানব, বাঙ্গালি নেতারা বিশেষত বামপন্থী ঘরানার নেতারা আরও বড়ো বিশ্বমানব ও 'কৃষক অন্তপ্রাণ'। তাই তারা সাত তাড়াতাড়ি ছুটেছেন কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন দিতে। ভেবে দেখার দরকারও মনে করেননি যে এতে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে নাকি স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের স্বার্থ অগ্রাহ্য করেই তারা এই আন্দোলনে সমর্থন দিচ্ছেন। অথচ যদি কৃষিক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে প্রভূত লাভের সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে কোল্ড স্টোরেজ, মান্ডি ব্যবস্থায় বেসরকারি বিনিয়োগ নতুন রক্ত সঞ্চালন করবে। চাষির কাছে সুযোগ আসবে সবজি, ফুল, ফল ইত্যাদি লাভজনক চাষের।

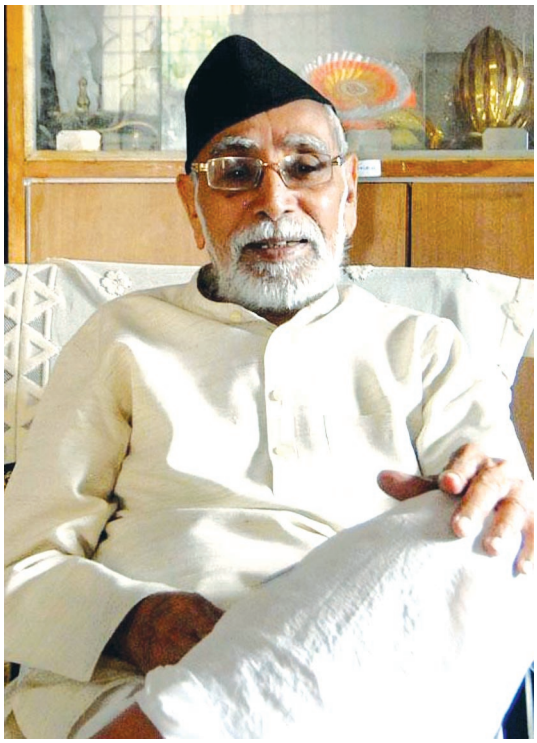

আদর্শ কার্যকর্তা ছিলেন মাধবগোবিন্দ বৈদ্য

ড. তিলক রঞ্জন বেরা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বয়স প্রায় একশো বছর। সঙ্ঘের ইতিহাসে প্রথম দিককার স্বয়ংসেবকরা অনেকেই শতবর্ষ পার করে কার্যকর্তা হিসেবে সঙ্ঘের ভিতকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে ভবসাগর পার করেছেন। যে কজন এতদিন হাল ধরে ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম বাবুরাও বৈদ্য (মাধব গোবিন্দ বৈদ্যজী)। তিনি গত ১৮ ডিসেম্বর ভবলীলা সাঙ্গ করে ৯৭ বছর বয়সে অমৃতলোকে গমন করলেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৩ বছর বয়সে নাগপুর শহরে ছাত্রাবস্থায় সঙ্ঘপ্রবেশ করে শাখার মুখ্যশিক্ষক থেকে শুরু করে অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ, অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখের মতো গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। আদ্য সরসঙ্ঘচালক থেকে বর্তমান সরসঙ্ঘচালক পর্যন্ত পরপর ছয়জনের সান্নিধ্য লাভ করার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

এরকম একজন প্রতিভাবান জ্যেষ্ঠতম কার্যকর্তার মৃত্যু আমাদের কাছে মৃত্যু নয়, বরং আগামীদিনে পথ চলার মানসিক প্রস্তুতি। ব্যক্তিজীবনে সংস্কৃত সাহিত্যে এম.এ পাশ করে নাগপুরে কলেজে অধ্যাপনা করা ছাড়াও 'তরুণ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক, সঙ্ঘের প্রথম প্রবক্তা, বহু গ্রন্থের প্রণয়ন করেছেন। কথায় বলে, যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে'। ৫ পুত্র ও ৪ কন্যার পিতা তিনি। পাঁচ জনের মধ্যে দুজন পুত্র সঙ্ঘের সফল প্রচারক। দ্বিতীয় পুত্র ড. মনমোহন বৈদ্য (সঙ্ঘের সহসরকার্যবাহ) ও পঞ্চম ড. রামনারায়ণ বৈদ্য (বিশ্ববিভাগ)। গত কয়েকদিন আগেই নাগপুর মহানগরে তাঁর স্মরণসভায় ড. মনমোহন বৈদ্য পরিবারের কথা বলতে গিয়ে বলছিলেন— বিবাহের পরেই স্ত্রীকে বলেছিলেন তাঁর একপা সঙ্ঘে ও আর এক পা পরিবারে। ছোটো থেকে নিজের জীবনে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে শুচিতা ছিল, তেমনি নিয়োজনও ছিল।

সঙ্ঘের কার্যকর্তা হিসাবে বাকি স্বয়ংসেবকদের যেমন দিশা নির্দেশ করতেন, নিজের ছেলে-মেয়েদেরও প্রতিপদে লক্ষ্য রাখতেন। মনমোহনজী যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র— 'aim in life' নিয়ে রচনা লিখেছেন— সব ছাত্রের মতো তিনিও ভবিষ্যতে ডাক্তার, অধ্যাপক হওয়ার কথা লিখেছেন। বাবা অধ্যাপক বলে স্কুলে দেখানোর পূর্বে বাবাকে দেখিয়েছেন। বাবা বললেন ব্যক্তিজীবনের কথা তো লিখেছো— সমাজের কথা কোথায়? বালক অবস্থাতে বাবার সেই ইঙ্গিত পরবর্তীতে তাঁকে প্রচারক হিসেবে গড়ে তুলেছে। তাঁকে সঙ্ঘের অন্যতম সহসরকার্যবাহ হিসেবে আমরা পেয়েছি। পাঁচ পুত্র প্রত্যেকেই সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে সফল ও প্রতিষ্ঠিত। কলেজের অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণের পরেও কনিষ্ঠ পুত্রের পড়াশোনার জন্য আলাদা অর্থ গচ্ছিত রেখেছেন। কলেজের বেতন যাতে না দিতে হয় তার জন্য বাবার অবসর গ্রহণের কারণ দেখিয়ে পুত্র কলেজের অধ্যক্ষকে দরখাস্ত করেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ তা মঞ্জুর করেছে। বাবা প্রায় চারমাস পরে খোঁজ করে জানতে পারলেন— গত চারমাসের বেতন দেওয়া হয়নি। কারণ জেনে তিনি বললেন, 'না, কলেজের বেতন দেওয়ার মতো সামর্থ্য আমার আছে, আমি ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছি।' তাই চারমাসের বেতন ফাইন-সহ পুত্রের হাতে পাঠালেন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে ক্ষমা চেয়ে পত্র দিলেন। এরকমই ছোটো ছোটো বিষয়ে কঠোর শুচিতা ও নিয়েজিত জীবন রচনার উদাহরণ রেখে গেছেন যাতে তাঁকে দেখে ছেলেদের জীবন রচনা শুদ্ধ হয়। বয়সের কারণে 'তরুণ ভারতে'র দায়িত্ব ত্যাগ করেছেন। ৭৫ বছর বয়সের পরে সঙ্ঘের দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও দেশব্যাপী সঙ্ঘ তথা বিবিধ ক্ষেত্রের কার্যকর্তাদের নিয়মিত সাহায্য ও পরামর্শ দিয়ে গেছেন। ২০১৮ সালের মার্চ মাসে নাগপুরে প্রতিনিধি সভার বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে তাঁর জন্মদিন ছিল। সকলের ইচ্ছায় তাকে অসুস্থ অবস্থাতেও হুইল চেয়ারে বসিয়ে বৈঠক স্থানে আনা হয়েছিল। সকলের পক্ষ থেকে সরসঙ্ঘচালক মোহনজী গলায় মালা পরিয়ে প্রণাম করে সম্মান জানালেন, বললেন, এই বয়সেও বাবুরাওজী ব্যক্তিগত আলাপ চারিতার মাধ্যমে আশীর্বাদ ও পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। তিনিও উত্তরে বললেন, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হিসেবে যতটুকু সহযোগিতা করা সম্ভব ততটুকু করেই শান্তি পাচ্ছি।

সত্যিই যুবক অবস্থায় নববধূকে যেকথা বলেছিলেন, সেই ভাবেই এক পা পরিবারে রেখেই পরিবার ও সমাজের প্রতি সমান দিশা প্রদর্শন করে নিজের জীবনকে ধন্য করেছেন। পরবর্তী প্রজন্মকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন। শেষ দিন পর্যন্ত যোগ্য কার্যকর্তার ভূমিকা পালন করে আমাদের আশাকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সঙ্ঘের শতবর্ষেও তাঁর আশীর্বাণী শুনতে পাব— আমাদের সেই আশা পূর্ণ করার সুযোগ দিলেন না। গত ১৮ ডিসেম্বর তাঁর অন্তিম যাত্রার দিন নির্ধারিত ছিল— যে প্রদীপ দিয়ে হাজার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন সেই প্রদীপটাই নিভে গেল। □

নায়ক যখন গায়ক এবং গায়ক যখন নায়ক

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

অসিত বরণ মুখোপাধ্যায়

রূপশ্রী দত্ত

সংস্কৃতি জগতের ব্যক্তিদের মধ্যে দ্বিমুখী প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী হিসেবে কয়েকজনকে দেখা যায়। এঁরা কেউ কেউ মূলত অভিনয় শিল্পী, আবার গায়ক হিসাবেও প্রতিভাবান। কেউ মূলত গায়ক আবার দু' একটি ক্ষেত্রে অভিনয়-প্রতিভারও পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমোক্ত জনেদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিগত যুগের বিখ্যাত অভিনেতা অসিতবরণ এবং দ্বিতীয়োক্ত জনেদের মধ্যে স্মরণীয় হলেন চিরন্তন বিখ্যাত গায়ক ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। তাঁর জন্ম ১৯২২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। মৃত্যু ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৯২।

অসিতবরণ মুখোপাধ্যায় (১৯ নভেম্বর, ১৯১৩-২৭ নভেম্বর, ১৯৮৪) একজন বিখ্যাত তবলাশিল্পী, চলচ্চিত্রাভিনেতা, গায়ক ও নাট্যব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর ডাকনাম ছিল কালো। প্রথম জীবনে, আলিপুরের টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপে কাজ নিয়েছিলেন। এই গুণী মানুষটি জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে তবলা শিখে আকাশবাণী কলকাতার তবলা শিল্পী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। সংগীতের ব্যাপারে বয়োজ্যেষ্ঠ অভিনয়-সংগীত শিল্পী পাহাড়ী সান্যালের দ্বারা প্রভাবিত হন। অনেক সংগীতানুষ্ঠানে তিনি সংগীত পরিবেশন করেছেন।

অসিতবরণের প্রথম ছবি 'প্রতিশ্রুতি' (১৯৪১)। কয়েক বছরের মধ্যে নিজের অভিনীত ছবিতে গান গেয়ে সেগুলিকে হিট ও সুপারহিট করেন। তাঁর গাওয়া গান চারযুগ পরেও শ্রোতার কানে মধুবর্ষণ করে। তার চিনি চিনি/আমার বাঁশির সুরে সাড়া দেয়, তার ভীরু কিঙ্কিণী।

প্রতিশ্রুতি, কাশীনাথ, জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার, পরিণীতা, কার পাপে, দৃষ্টিদান, প্রত্যাবর্তন, অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী ইত্যাদি অসিতবরণ অভিনীত অবিস্মরণীয় ছবি। 'রঙ্গরস নামে একটি নাট্যগোষ্ঠী তিনি গড়েছিলেন। 'বন্ধু' ছবিতে তবলাবাদক হিসাবে অসিতবরণকে উত্তমকুমারের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। বাস্তবে তিনি তবলা শিল্পী ছিলেন বলেই ওই দৃশ্য অতটা স্বাভাবিক হয়েছিল।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য বাংলা ও হিন্দি গানের একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। তাঁর প্রথম গান 'যদি ভুলে যাও মোরে, জানাব না অভিমান'। ১৯৪০ সালে রেকর্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল পাইওনিয়ার কোম্পানি থেকে। ১৯৫৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'সাধক রামপ্রসাদ' ছবিতে ২৪টি শ্যামাসংগীতের মধ্যে ২৩টিই ধনঞ্জয়ের কণ্ঠে গীত। বাউল, পদাবলী কীর্তন, রামপ্রসাদী, হিন্দুস্থানি, নজরুলগীতি ইত্যাদির প্রায় পাঁচশো রেকর্ড আছে তাঁর। পঞ্চাশ বছরেরও অধিক তাঁর সংগীত জীবন। তিনি গীতিকারও ছিলেন। প্রায় চারশোর মতো গান রচনা করেছিলেন। শ্রীপার্থ ও শ্রীআনন্দ ছদ্মনামে তিনি সংগীত রচনা করেছিলেন। নববিধান, পাশের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি তাঁর অভিনীত চলচ্চিত্র। শ্বশুরবাড়ি একটি হাসির ছবি। দুই যমজ বোনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। চঞ্চল, উচ্ছল ও শান্ত দুই বিপরীত স্বভাবের নারী হিসেবে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত স্বাভাবিক অভিনয় করেছিলেন। একজনের স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এক বোনের স্বামীর ভূমিকার অভিনেতা ছিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পাশের বাড়ি ছবিতে ধনঞ্জয়ের স্ব-কণ্ঠে গীত— ঝির্ ঝির্ ঝির্ ঝিরি বরষা/হায় কি গো ভরসা আমার ভাঙা ঘরে তুমি বিনে/শন্ শন্ শন্ শন্ বয় হাওয়া, মিছে গান গাওয়া এমন দিনে। গানটির কথা ও সুর সলিল চৌধুরী। 'মাটিতে জন্ম নিলাম', 'ঝনন ঝনন বাজে' তাঁর দুটি অন্যতম জনপ্রিয় গান। রানি রাসমণি ছবিতে ভক্তিগীতি গেয়ে তিনি স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন।

জনপ্রিয় শ্যামাসংগীত শিল্পী ও সহোদর পান্নালাল ভট্টাচার্য্যের আত্মহত্যার পর শোকগ্রস্ত মনে তাঁর পরিবারের দায়িত্ব বহন করেছিলেন। 'জয় মা তারা' 'লেডিস সিট, ছবিতে তিনি সংগীত পরিচালক ছিলেন।

অক্টোপাস

সাগরের এক রহস্যময় প্রাণীর নাম অক্টোপাস। নামেতেই যেন জড়িয়ে আছে গা ছমছম করা ভাব। শব্দটি লাতিন। ইংরজিতে বলা হয় ডেভিল

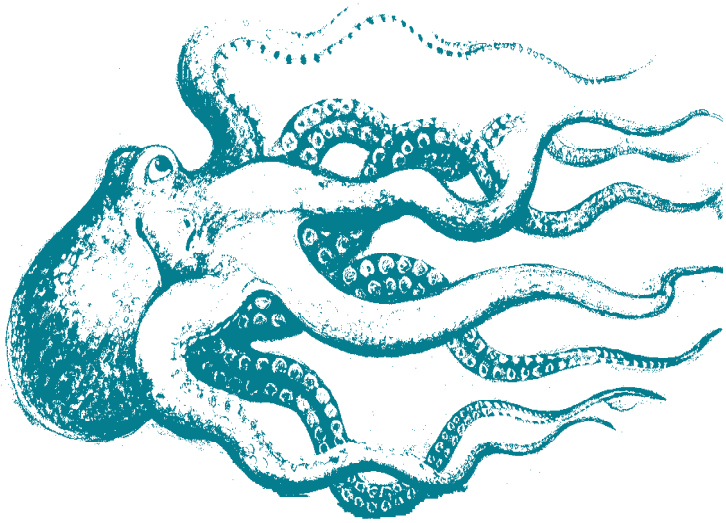

ফিশ। এদের দেহের গড়ন এক রোমঞ্চকর ব্যাপার। গল্পে বলা হয় অক্টোপাস জলের দৈত্য। অক্টোপাস গোষ্ঠীকে জীববিজ্ঞানীরা বলেন 'সেফালোপড'। গ্রিক ভাষায় সেফালোর অর্থ মাথা আর পডের অর্থ পা। অর্থাৎ শিরঃপদ। মাথার সঙ্গে পা লাগানো থাকে। অক্টোপাসের আটখানা হিলহিলে শুঁড়ই তাদের পা। নিষ্ঠুর চোখদুটিতে মনে হয় যেন সবসময় আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। এখন পর্যন্ত দেড়শো প্রজাতির অক্টোপাসের সন্ধান পাওয়া গেছে।

অক্টোপাস সমুদ্রের কোমল দেহের প্রাণী। দেহে কোনো অস্থি থাকে না। প্রতিটি বাহু বা শুঁড়ে থাকে ২৪০ টি কারে বায়ুশূন্য শোষকবাটি। এরফলে কোনো বস্তু বাহু দিয়ে চেপে ধরলে কোনো ভাবেই তা ছড়ানো শক্ত ব্যাপার। এই শোষরবাটি ও মাংসপেশীর জন্য অক্টোপাস সাগরের এক চলন্ত বিভীষিকা যেন। শিকারকে বাহুপাশে বেঁধে নেওয়ার পর শিকারের গায়ে এরা বিষ ঢেলে দেয়। এদের মুখের মধ্যে থাকে বিষের থলি। এছাড়া এদের মাথার নীচে থাকে একটি টিউব ভর্তি কালো রং। প্রয়োজনে শিকারকে বাগে আনার জন্য এই কালো রং পিচকারির মতো ছড়িয়ে দেয়। এরা ইচ্ছে মতো এদের বাহু, শুঁড় বা পা বাড়াতে পারে, ছুটতেও পারে তীব্রগতিতে

এদের চোয়াল খুব শক্তিশালী। চোয়ালে দাঁত থাকে না। শক্ত কাঁটার মতো চোয়াল দিয়েই রাক্ষুসে খাওয়া খেতে পারে। এরা বসবাস করে সমুদ্রের গভীর অংশে চোরা পাহাড়ের গুহায়। সব চেয়ে বড়ো অক্টোপাসকে সমুদ্রের দানব বলা হয়। সাধারণ ভাবে এদের এক একটা শুঁড় তিরিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। আবার সব চাইতে ছোটো প্রজাতির অক্টোপাস হয় মাত্র দেড় ইঞ্চি। এদের বসবাস ভারত মহাসাগরে।

অক্টোপাসের শক্তি অবাক করার মতো। একটি এক কেজি ওজনের অক্টোপাস কুড়ি কেজি ওজনের কোনো বস্তুকে খুব সহজে টেনে নিতে পারে জলের তলায়। গায়ের রং ফ্যাকাসে। ইচ্ছে মতো রং বদলাতে পারে। শীতের শেষে অর্থাৎ বসন্তকালের প্রথমদিকের মধ্যে এরা সাধারণত ডিম দেয়। ডিমগুলি সমুদ্রের গভীরে চোরা পাহাড়ের গুহা লুকিয়ে রাখে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে সময় নেয় চার থেকে আট সপ্তাহ। এই সময় মা অক্টোপাস ডিমগুলি পাহারা দেয়। যতদিন না ডিম ফুটছে মা কোথাও যায় না। জলে থাকা প্রাণীরা অক্টোপাসকে দেখতে পায় না। কিন্তু অক্টোপাস তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সব দেখে। সুযোগ বুঝে শিকারকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। এরা যদি কোনো মানুষের হাত বা পা জড়িয়ে ধরে তাহলে হাতের সাহায্যে তা ছাড়ানো অসম্ভব। আর এদের একটা শুঁড় কাটা পড়লে অল্পদিন পর আবার তা গজিয়ে ওঠে।

এদের বহু প্রজাতির মধ্যে ছোটো সাইজের গুলোকে বিজ্ঞানীরা 'অক্টোপাস ভালগারিস' বলেন। ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে এদের দেখা যায়। এদের মধ্যে যেগুলো চেহারায় বিশাল সেগুলোই হলো দানব অক্টোপাস। এরা অত্যন্ত চতুর প্রাণী। এদের নিয়ে বহু গল্পকথা আছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অবজারভেশনাল লার্নিং বা ট্রেনিং পেলে অক্টোপাসরা বহু কিছু রপ্ত করতে পারে।

—তাপস অধিকারী

ভারতের পথে পথে

ধরমশালা

হিমাচলের কাংড়া জেলার সদর সহর ধরমশালা। তিব্বতীয় ধর্মগুরু ১৪ তম দলাইলামা ১৯৫৯ সালে ধরমশালোকে বিশ্ব মানচিত্রের আলোকে তুলে আনেন। সিমলা ও মানালির তুল্য না হলেও দিন দিন পর্যটকদের আনাগোনা বেড়েই চলেছে ধরমশালায়। এখানে বৃষ্টির আধিক্য আছে। ১২৫০ মিটার উঁচুতে লোয়ার ধরমশালায় রয়েছে বণিজ্যকেন্দ্র, বসতি ও বাসস্ট্যান্ড। পাশেই রয়েছে কাংড়া আর্ট মিউজিয়াম। রছেয়ে দেবী মহাকালী মন্দির ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিপূত হরিকুঠি। এখানে স্বা বিবেকানন্দ কিছুকাল বাসও করেন। ১৮৩০ মিটার উঁচুতে আছে ম্যাকলয়েডগঞ্জ ও ফরসিথগঞ্জ। এখানে রয়েছে ব্রোঞ্জে গিলটি করা ন'ফুটের বুদ্ধমূর্তি এবং ১১ মাথার অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি। রয়েছে মনাস্ট্রি। এর পাশে কটেজধর্মী দলাইলামার বাসভবন ও চীনা আক্রমণে শহিদ তিব্বতীয়দের স্মরণে শহিদবেদি।

জানো কি?

জনক বা পুরোধাপুরুষ (ভারতীয়)

- রাজনীতির পুরোধাপুরুষ চাণক্য বা কৌটিল্য।
- শল্যচিকিৎসার জলক সুশ্রুত।
- মেডিসিনের জনক চরক।
- পরিসংখ্যানের জনক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ।
- মহাকাশ গবেষণার জনক বিক্রম সারাভাই।
- চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ দাদা সাহেব ফালকে।
- পেন্টিঙের জনক নন্দলাল বসু।
- মিসাইলের জনক এপিজে আব্দুল কালাম।

ভালো কথা

করোনার ভয়ে

করোনার জন্য আমরা সবাই ভয়ে ভয়ে আছি। ঠাকুমা বলল এই ভয়ের মধ্যেও আমরা কিছু ভালো অভ্যাস রপ্ত করে ফেললাম। বাইরে থেকে এসে ভালো করে হাত-পা ধোওয়া, অকারণে চোখে-নাকে -মুখে হাত না দেওয়া। হাঁচি-কাশির সময় মুখে রুমাল চাপা দেওয়া, কোনো কিছু খাওয়ার আগে ভালো করে হাত ধোওয়া ইত্যাদি। আমার সব সময় দাঁত দিয়ে নখ কাটার বদ অভ্যাস ছিল, করোনার ভয়ে সেটা আমি ছেড়ে দিয়েছি। জেঠু বলল, শুধু তুই কেন, করোনার ভয়ে আমাদের দেশের মানুষ বহু বদ অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে। আমি মনে মনে ভাবছি এই ভয়টা সারা জীবন থাকলেই করোনা কেন করোনার ঠাকুরদাদাও আমাদের কিছু করতে পারবে না।

পূর্ণিমা কুমার, অষ্টম শ্রেণী, আড়ষা, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ফুটবে আলো

সুপর্ণা মণ্ডল, ষষ্ঠ শ্রেণী, পাঁচবাগা, বাঁকুড়া

এই করানায় ভালো লাগে না আর এখন,
আবার কবে হবে সেই আগের মতন?
সবাই বলে খারাপ সময় বেশিদিন চলে না,
যদিও খারাপ খবর ছাড়া চ্যানেলের দিন কাটে না।

কবে আবার স্কুলে যাব ঠাসাঠাসি বসব,
দিদিমণির বকুনিতে স্তব্ধ হয়ে যাব।
বাড়ি বসে অনলাইনে পড়ার চেয়ে ভালো
আবার কবে ফুটবে দেশে আগের মতো আলো ?

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ২৯।।

অবশেষে চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শ করে কার্যকর্তারা তাঁকে বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

একবার গাড়িতে যেতে যেতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সঙ্ঘের পথসঞ্চলন দেখেন। ডাক্তার হেডগেওয়ার সম্পর্কে তিনি আগেই অনেক কিছু শুনেছিলেন। ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করার তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল। নাসিকে ডাক্তারজী অসুস্থ থাকাকালীন তিনি খবরও পাঠান। তারপর নিজে নাগপুর এসে...

ডাক্তারজীর শরীর খারাপের দিকেই চলল। হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। পরে তাঁকে ঘটাটেজীর বাংলোয় আনা হয়।

গৌড়ীয় নৃত্য ভারতের প্রাচীন নৃত্যধারাগুলির অন্যতম

মহুয়া মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালির নিজস্ব ধ্রুপদীধারার নৃত্যের প্রসঙ্গ উঠলে গৌড়ীয় নৃত্যের কথা স্বভাবতই এসে পড়ে। বাঙ্গালি নৃত্য-গীতপ্রিয় জাতি। লোকনৃত্যের পাশাপাশি বাঙ্গালির ধ্রুপদী নৃত্যধারাও প্রাচীনকাল থেকে বহমান। এই নৃত্যধারার লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার ভরতমুনি রচিত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে। এছাড়া দৃশ্যমান মৃৎভাস্কর্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক চতুর্থ শতকে চন্দ্রকেতুগড় থেকে। অর্থাৎ এই প্রমাণগুলি থেকেই বোঝা যায় যে বঙ্গদেশের মাটিতে শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা প্রাচীনকাল থেকে প্রবহমান। সেই প্রবহমানতা বয়ে চলেছে বাংলা সাহিত্যে, সংস্কৃত সাহিত্যে, শাস্ত্রে, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায়, লেখমালায়, গ্রামীণ গুরু পরম্পরায়।

সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে যুগ যুগ ধরে ভারতের সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে সাহায্য করেছে বাঙ্গলার গীত-বাদ্য-নৃত্য তথা সংগীত শাস্ত্রজ্ঞরা। চান্দ্রব্যাকরণ প্রণেতা চন্দ্রগোমিন খ্রিস্টিয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে জীবিত ছিলেন। তিনি 'তারা ও মঞ্জুশ্রী স্তোত্র' এবং 'লোকানন্দ নাটক' রচনা করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। চর্যাপদ ও নাথ সাহিত্যে বৌদ্ধ সাধকদের সাধন সংগীত অর্থাৎ ওই গ্রন্থগুলিতে তৎকালীন বাঙ্গালির নাট্যাভিনয়ের সংকেত পাওয়া যায়। চর্যাপদে আছে এক ডোমরমণী একটি চৌষট্টি দলযুক্ত পদ্মের ওপর অতি লঘু পদক্ষেপে নৃত্য করছেন—

'একসো পদুমা চৌষঠী পাখুড়ী।
তাঁই চড়ি নাচ অ ডোম্বী বাপুড়ী। চর্যাপদ সৎ ১০।।

নাথ গীতিকায় গোরক্ষনাথের নৃত্যের বেশভূষার বর্ণনা আছে—

'অলঙ্কার পাইয়া নাথ করিল ভূষণ,
একে একে পরিলেক যথ আভরণ।
গলাতে দিলেন নাথ সাতছড়ি হার,
করেতে কঙ্কন দিল অতি শোভাকর।'

নৃত্যগীতেরও বর্ণনা পাওয়া যায়—

'নাচন্তি যে গোর্খনাথ মাদলে করি ভর
মাটিতে না লাগে পদ আলগা উপর।
নাচন্তি যে গোর্খনাথ ঘাঘরের রোলে,

কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে।'

বঙ্গদেশের সাহিত্য ও শিল্পের ইতিহাসে ধারাবাহিকতার সুত্রপাত পালরাজাদের সময় থেকে। পালযুগের পর সেনযুগ। সেনযুগ সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ। এই যুগে নৃত্যগীত চর্চার গুরুদের 'নট' অভিধায় ভূষিত করা হতো। যেমন, নটগঙ্গোক, জয় নট প্রমুখ। লক্ষ্ম ণ সেনের দরবারে ধোয়ী, শরণ, উমাপতিধর, গোবর্ধন আচার্য ও জয়দেব— এই পাঁচজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। গোবর্ধন আচার্য রচিত 'আর্যা-সপ্তশতী'-তে বাঙ্গলার ধ্রুপদী সংগীত তথা গীত-বাদ্য ও নৃত্যের সংবাদ পাওয়া যায়।

স্বয়ং জয়দেব সংগীত বিশারদ ছিলেন। 'গীতগোবিন্দ' গাইবার ও নাচবার জন্য জয়দেবের দল ছিল। শোনা যায় পদ্মাবতী সেই দলে নাচতেন এবং জয়দেব মৃদঙ্গ বাজাতেন। গীতগোবিন্দের পদগুলিতে সেকালের নৃত্য-গীত বা নাটযাত্রা পালার নিদর্শন পাওয়া যায়।

সেন যুগের পর অর্থাৎ খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতাব্দী শেষ হতে না হতেই বঙ্গদেশে তুর্কি আক্রমণের ঝড় বয়ে গেছিল। তুর্কি বিজয়ের প্রথম দিকটা ছিল ধ্বংসের পর্ব। মোটামুটি ১২০০-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ এই দেড়শো বছর বাঙ্গলার সংস্কৃতিক বা সামাজিক চিত্র পাওয়া যায় না। বাঙ্গলার বুকে সার্ধ শতাব্দীর নিস্তব্ধতাই তুর্কিবিজয়ের চরম ভয়াবহতার প্রমাণ। এই সময়কার বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত থেকে জানা যায় যে সেই যুগে রাত জেগে লোক মনসার গান শুনতো, যোগী পাল, ভোগীপালের গীত শুনতো, চণ্ডীবাশুলি গাইতো, কৃষ্ণলীলা খুবই জনপ্রিয় ছিল। এগুলির প্রধান রূপ ছিল গীত ও পাঁচালী। পাঁচালী এক ধরনের গান— মৃদঙ্গ, মন্দিরা, চামর হাতে নৃত্য সহযোগে পরিবেশিত হতো। মূল গায়েন গাইতো এবং নাচতো, অন্যরা দোহার হিসেবে হতো তার সহযোগী। উত্তর-প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণলীলা অভিনীত হতো— তাকে বলা হলো নাটগীত বা নাট্যগীত। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দ) কৃষ্ণলীলার প্রথম বাংলা কাব্য। বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অভিনীত হতো। নৃত্য ও অভিনয়ের দ্বারা কাব্যের রসকে ব্যঞ্জনা দেওয়া হতো। বাংলা সাহিত্যের আরও এক শক্তিশালী শাখা মঙ্গলকাব্য নৃত্যগীতের বর্ণনায় ভরপুর। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে শিবের নৃত্যের বর্ণনা আছে—

'পদ্মারে লইয়া কাঁখে নাচে শিব ঘন পাকে।'

বেহুলার নৃত্য-গীত-বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা আছে—

'সেই সজ্জ দিয়া বেউলা করিলেক সাজ।
বিশ্বাবসু চিত্রসেন দুই বাইন রাজ।।
তাল টংকারিয়া কৈল মৃদঙ্গ আঘাত।
ধ্যান ভাঙ্গি ফিরিয়া বসিলা ভোলানাথ।।
আলাপেয়ে পঞ্চমেতে বসন্তবাহার।
তার শেষে নৃত্য করে তালে করি ভর।।

মনসামঙ্গল কাব্যের পশাপাশি 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও নর্তকী রত্নমালার বেশভূষা প্রসাধনের বর্ণনা পাই—

সুরঙ্গ পাটের ছাদে বিচিত্র কবরী বাঁধে
মালতী মল্লিকা চাঁপা গাভা।
কপালে সিন্দুর ফোঁটা প্রভাতে ভানুর ছটা
চৌদিকে চন্দনবিন্দু শোভা।
পরি দিব্যপাট শাড়ী কনক রচিত চুড়ি
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।
হীরা নীলা মোতিপলা কলধৌত কণ্ঠমালা
কলেবর মলয়জ পঙ্ক।।

নৃত্য ও গীত এদেশে সাধনার বিষয়বস্তু ছিল। নৃত্যকালীন তালভঙ্গ সে যুগের সমাজের কাছে এক কঠিন অপরাধ বলে গণ্য করা হতো। যার উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে পাই। মনসামঙ্গল কাব্যে উষা-অনিরুদ্ধের তালভঙ্গের বর্ণনা আছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এবং অন্যান্য মঙ্গল কাব্যগুলিতে তালভঙ্গের বর্ণনা আছে। উপরোক্ত বর্ণনাগুলি পড়লেই বোঝা যায় যে বাংলার ধ্রুপদী নৃত্যধারা কতটা শক্তিশালী ছিল যার প্রতিফলন ঘটেছে বাংলা সাহিত্যে। রাগ-রাগিনীর সঙ্গে যে নৃত্য পরিবেশিত হতো তা নিশ্চিত করে বলা যায় শাস্ত্রীয় নৃত্য। শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ীয় নৃত্যের মধ্যমণি। পঞ্চদশ শতকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষের নৃত্যকলাকে সমৃদ্ধ করেছে। শ্রীচৈতন্যদেব 'নৃত্যসংকীর্তন' করতেন। তাঁর নাচের প্রকার ছিল দু'রকম— উচ্চণ্ড অর্থাৎ তাণ্ডব এবং মধুর অর্থাৎ লাস্য।

বাংলা সাহিত্যের পাশাপশি সংস্কৃত সাহিত্যেও বাঙ্গলার দেবদাসীদের মন্দিরকেন্দ্রিক শাস্ত্রীয় নৃত্যের বিবরণ পাওয়া যায়। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে গৌড়দেশবাসিনী মেয়েদের বর্ণনা আছে।

'মৃদুভাষিণ্যোহমুরাগবত্যো মৃদঙ্গশ্চ গৌত্যঃ।'

কাশ্মীরে প্রখ্যাত কবি কলহন রচিত 'রাজতরঙ্গিনী'-তে আমরা যে তথ্য পাই তা হলো, কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড় যখন ছদ্মবেশে গৌড়বঙ্গের পৌন্ড্রবর্ধন শহরে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের মন্দিরে তখন দেখতে পান ভরতনাট্য শাস্ত্র অনুসরণ করে মন্দিরে দেবদাসী কমলার নৃত্য হচ্ছে।

'মণ্ডলেষু নরেন্দ্রাণাং পয়েদানামিবার্যমা।
গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভুজা।।
প্রবিবেশ ক্রমেনাথ নগরং পৌন্ড্রবর্ধনম্।
তস্মিন সৌরাজ্য-রম্যাভিঃ প্রীতঃ পৌরবিভূতিভিঃ।।
লাস্যং স দ্রষ্টুমবিশৎ কার্তিকেয়নিকেতনম্।
ভরতানুগমালক্ষ্য নৃত্যগীতাদিশাস্ত্রবিৎ।।
ততো দেবগৃহদ্বার-শিলামধ্যাস্ত স ক্ষণম্।
তেজোবিশেষচকিতৈর্জনৈঃ পরিহৃতান্তিকম্।।
নর্তকী কমলানাম কান্তিমন্তং দদর্শতম্।।'

পালরাজা রামপালের সময় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' কাব্যে দেবদাসীদের কথা জানা যায়। সাহিত্যের পাশাপাশি সংগীত তথা নৃত্যশাস্ত্র গ্রন্থে গৌড়ীয় নৃত্যের বিস্তারিত আলোচনা আছে। সর্বভারতীয় নৃত্যশাস্ত্র গ্রন্থ ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের 'প্রবৃত্তি' নামক চতুর্দশ অধ্যয়ে চারপ্রকার নাট্য তথা নৃত্যের উল্লেখ আছে— দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী, আবন্তী ও ওড্রমাগধী। এই 'ওড্রমাগধী' নৃত্যই গৌড়বঙ্গে প্রচলিত ছিল। গৌড়ীয় নর্তক-নর্তকীরা কেমন রূপসজ্জা বেশভূষা করবে তারও উল্লেখ আছে নাট্যশাস্ত্রে—

'গৌড়ী নামলকং প্রায় সশিখা পাশবেণিকম্'

পরবর্তীকালে মতঙ্গমুনির 'বৃহদ্দেশী'-তে (আনুঃ ৫ম-৭ম শতক) আছে গৌড়রাগ, গৌড়কৈশিকী, গৌড়পঞ্চমা রাগের সঙ্গে নবরসযুক্ত নৃত্যাভিনয় তথা নাট্যাভিনয়ের কথা। সংগীত রত্নাকরে (আনুঃ ১২২৭-১২৪০) সংগীতের স্বরূপভিত্তিক ভারতভূমিকে পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে— লাট, কর্ণাট, দ্রাবিড়, অন্ধ্র ও গৌড়। এগুলি তো সর্বভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ, এর পাশাপাশি আঞ্চলিক শাস্ত্রগ্রন্থ ওড়িশার মহেশ্বর মহাপাত্র রচিত অভিনয়চন্দ্রিকা (আনুঃ অষ্টাদশ শতক)-কে তৎকলীন ভারতবর্ষে প্রচলিত সাতরকম শাস্ত্রীয় নৃত্যের উল্লেখ আছে তার মধ্যে স্পষ্টভাবে গৌড় নৃত্যশৈলীর উল্লেখ আছে। গৌড়ীয় নৃত্যের মূল শাস্ত্রগ্রন্থ দুটি যা এই গৌড়বঙ্গের সংগীত শাস্ত্রকারের রচনা। সংগীত দামোদর এবং শ্রীহস্তমুক্তাবলী দুটি গ্রন্থই পণ্ডিত শুভঙ্করের রচনা (আনুঃ ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতক)। এছাড়াও বাঙ্গলায় গৌড়ীয় নৃত্যের আরও বহু শাস্ত্রগ্রন্থ রয়েছে, তার মধ্যে দু' চারটির উল্লেখ করা হলো—

গ্রন্থ	রচয়িতা	সময়কাল
উজ্জ্বলনীলমণি	শ্রীরূপগোস্বামী	পঞ্চদশ শতক
নাটকচন্দ্রিকা	"	"
আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ	কবি কর্ণপুর	"
গোবিন্দলীলামৃতম	শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ	ষোড়শ শতক
নায়িকা রত্নমালা	চন্দ্রশেখর-শশীশেখর	সপ্তদশ শতক
শ্রীভক্তিরত্নাকর	শ্রীনরহরি চক্রবর্তী	অষ্টাদশ শতক
সংগীত সারসংগ্রহ	"	"

সাহিত্য এবং শাস্ত্রগ্রন্থের পাশাশি বাঙ্গলার ধ্রুপদী নৃত্যের সাক্ষ্য রয়ে গেছে ভাস্কর্যে, চিত্রকলা, লেখমালায়। লেখমালা থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে দেবদাসী সুতনুকার কথা, দশম শতকে রাজা নয়পালদেবের সময় দ্বাদশভৌম অর্থাৎ বারোতলা মন্দির এবং সেখনে সহস্র দেবদাসীদের কথা জানা যায়। বাঙ্গলায় বহু ধরনের উপাদান দিয়ে নৃত্যমূর্তি তৈরি হয়েছে। যথা— মৃৎফলক, প্রস্তর, ধাতব, হাতির দাঁত, শোলা, বাঁশ ইত্যাদি। তাম্রলিপ্ত, চন্দ্রকেতুগড় ইত্যাদি অঞ্চলে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের যেসব মৃৎভাস্কর্য পাওয়া গেছে সেখানেও মিলেছে নৃত্যমূর্তি। পাল ও সেন যুগে বিরাট বড়ো বড়ো মন্দির ছিল যেমন— ত্রিবেণীতে মুরারীমোহনের মন্দির যা তুর্কি আক্রমণের পর জাফরখাঁ গাজির মসজিদে রূপান্তরিত হয়। মালদহে আদিনা মসজিদ (কথিত যা অষ্টম শতকে রাজা গোপালের সময় নির্মিত আদ্যানাথের মন্দির ছিল)। পাল-সেন যুগে বহু ভাস্কর্য পাওয়া যায় যা পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালা, বাংলাদেশে সংগ্রহশালা, ভারতবর্ষের জাতীয় সংগ্রহশালা ও অন্যান্য সংগ্রহশালায়, বিদেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। পালযুগে সূক্ষ্মচিত্রকলা (Miniature Painting)-গুলি শাস্ত্রীয় নৃত্যের নিদর্শন বহন করে। চৈতন্যোত্তর কালে বাঙ্গলার টেরাকোটা মন্দির ভাস্কর্যগুলি এবং চিত্রকলাগুলি ধারাবাহিক ভাবে বহমান শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলির অপূর্ব নিদর্শন মেলে ধরে আছে।

এগুলির পাশপাশি বাঙ্গলার সজীবধারায় গুরু-শিষ্য পরম্পরা লোকায়ত নৃত্যধারাগুলি এই গৌড়ীয় নৃত্যের নিদর্শন বয়ে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— কীর্তননৃত্য, নাচনী (দেবদাসী ধারার একটি রূপ), সেবাদাসী নৃত্যধারা, ছৌনৃত্য, মঙ্গলকাব্যের নৃত্যধরা, কুশান ইত্যাদি এই পরম্পরাই বহন করে চলেছে।

হাজার হাজার বছর ধরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গৌড়ীয় নৃত্য তার পথ পরিক্রমা করে চলেছে। কখনও গুপ্ত ও সুপ্ত ভাবে, কখনও-বা প্রকাশ্যে। 'গৌড়ীয় নৃত্য' প্রাচীন বাঙ্গলার ধ্রুপদী নৃত্যধারা বিবর্তনের পথ ধরে আধুনিক ভারতের পাদপ্রদীপে এসে দাঁড়িয়েছে তার বিগতদিনের বহু ঐশ্বর্যসম্ভারে পুনর্গঠিত রূপে। শাশ্বত তার এই পথ পরিক্রমা।

ঋণ স্বীকার : প্রয়াত গুরু অধ্যাপক ড. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রয়াত অধ্যাপক ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ড. পল্লব সেনগুপ্ত, অধ্যাপক ড. অশোক ভট্টাচার্য, অধ্যপক ড. আর নাগস্বামী (চেন্নাই), গৌড়ীয় সংগীত গবেষক পণ্ডিত অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রয়াত কীর্তনাচার্য শ্রীনরোত্তম সান্যাল, নাচনীগুরু শশী মাহাতো, ঝুমুর কীর্তনীয়া প্রয়াত পবিত্র ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে।

(লেখিকা বিশিষ্ট নৃত্য গবেষিকা এবং প্রাবন্ধিক)

মকর সংক্রান্তি উৎসবের শুভক্ষণে
বনবাসী বন্ধুদের সাহায্যার্থে
বস্তু এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন।

তুমি-আমি এক রক্ত

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

১৬১/১ এম জি রোড, রুম নং ৫১
বাঙ্গুর বিল্ডিং, সেকেন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭
ফোন : ২২৬৮০৯৬২, ২২৭৩৫৭৯২
E-mail : kalyanashram.kol@gmail.com

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ
বর্ণ চতুষ্টয় ও শিক্ষা

ইন্দুমতী কাটদরে

বর্ণানুসারী শিক্ষা ব্যবস্থা :

ব্রাহ্মণবর্ণের শিক্ষা :

ব্রাহ্মণের শিক্ষার বিষয়গুলি এরকম :

(১) ব্রাহ্মণকে সর্বপ্রথম নিশ্চিত করে নিতে হবে যে সে ব্রাহ্মণ থাকবে কিনা, কারণ ব্রাহ্মণের আচার পালন সহজ নয়। এই কথার উল্লেখ এই কারণে করতে হয় কারণ আজ বিনা আচার পালন করেই ব্রাহ্মণ নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলবার চেষ্টা করে থাকে। এই অনুচিত ব্যবহারকে ঠিক করবার জন্য ব্রাহ্মণের শিক্ষার প্রথম ধাপ আচারের হওয়া উচিত। আচারের শুদ্ধতা ও পবিত্রতা হচ্ছে প্রথম কথা। আহার বিহারের পবিত্রতা ও শুদ্ধতাও দরকার। শুদ্ধতা ও পবিত্রতার ব্যাখ্যা করবার খুব আবশ্যকতা নেই, কেননা সাধারণভাবে সেটা সবারই জানা।

(২) আহার বিহারের শুদ্ধতা ও পবিত্রতার জন্য সংযম ও তপশ্চর্যার প্রয়োজন। সে তো ব্রাহ্মণই নয় যে এই দুটিকে পালন করে না। অতএব এই দুটোই হচ্ছে তার শিক্ষার বিশিষ্ট অঙ্গ।

(৩) শাস্ত্রের অধ্যয়ন করা ব্রাহ্মণের সামাজিক দায়িত্ব। শাস্ত্রের রক্ষা করা হচ্ছে তার জ্ঞানাত্মক দায়িত্ব। অধ্যয়নের শাস্ত্র বলছে যে বুদ্ধির শুদ্ধতা, পবিত্রতা ও তেজস্বিতার জন্য আহার বিহারের শুদ্ধতা আবশ্যক। শাস্ত্রের অধ্যয়ন করবার জন্য শিশু অবস্থা, বাল্যাবস্থা ও কিশোরাবস্থার জন্য অধ্যয়ন পদ্ধতি আছে তাকে গ্রহণ করে শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যয়ন করতে হবে। এই কথার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে ব্যবহারিক শিক্ষা তো তাকে করতেই হবে।

(৪) শাস্ত্রীয় অধ্যয়নের জন্য আবশ্যকীয় আচারের শিক্ষা তার বাড়ি থেকেই প্রাপ্ত হওয়া দরকার। কেননা সেটা বাড়িতেই পাওয়া সম্ভব। শাস্ত্রের শিক্ষা তার গুরুকুলে হতে পারে। গুরুকুল যদি আবাসিক হয় তবে সেটা হচ্ছে গুরুগৃহবাস। এজন্যই তার আচরণের শিক্ষা সেখানেও প্রাপ্ত হতে পারে।

(৫) ব্রাহ্মণকে পৌরোহিত্য করতে হয়। এজন্য মন্ত্রের উচ্চারণ ও গান, যজ্ঞের বিধি, সংস্কারের বিধি, বিভিন্ন পূজার বিধি তাকে শিখতে হবে। সংস্কারের সব কর্মকাণ্ড বর্তমান সমাজে না বুঝেই করা হয়ে থাকে। এমন অবস্থা যেন না থাকে— এই দৃষ্টিতে তা অধ্যয়ন করতে হবে, এবং পৌরোহিত্য করতে হবে।

(৬) শাস্ত্রাদির অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাকে অধ্যাপনাও করতে হবে এজন্য অধ্যাপন শাস্ত্রের শিক্ষাও তার লাভ করা উচিত।

(৭) পারম্পরিকরূপে তাকে অধ্যাপনা অথবা পৌরোহিত্যকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম বানাবার দরকার নেই। এটা কেবল প্রাচীনকালেই সম্ভব ছিল এমনটা নয়। আজকের দিনেও তাকে সম্ভবে পরিণত করতে হবে। সরলতা সংযম ও তপশ্চর্যা অসহায়তা নয়, এটা হচ্ছে চরিত্রের উন্নয়ন— এই বিশ্বাস সমাজে জাগৃত করা এবং প্রতিষ্ঠিত করা তার কর্তব্য। এজন্য সমাজের ওপর ভরসা রাখার প্রয়োজন আছে।

(৮) শাস্ত্রকে যুগানুকুল বানাবার জন্য ব্যবহারিক অনুসন্ধান হচ্ছে তার কাজ। এটাও হচ্ছে তার শিক্ষার বিশিষ্ট অংশ।

(৯) বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে একে উচ্চশিক্ষা বলা হয়ে থাকে। উচ্চশিক্ষার দুই বিশেষ বিষয় হচ্ছে তত্ত্বচিন্তন ও অনুসন্ধান। আজ এই দুটি কাজ যে কেউ করে থাকেন। শুধু ব্রাহ্মণেই করবে এই কথায় সর্বত্রই বিতর্ক হবে। আমরা বলতে পারি যে, যে ব্যক্তিত্ব আচার বিচার আহার-বিহারে শুদ্ধতা ও পবিত্রতা রাখতে পারে, সংযম ও সরলতা রাখতে পারে, তপশ্চর্যা করতে পারে, বিদ্যাপ্রীতি, জ্ঞাননিষ্ঠা ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা তথা পবিত্রতার জন্য কষ্ট সহ্য করতে পারে এবং নিজের নির্বাহের জন্য সমাজের ওপর ভরসা করতে পারে সেই হচ্ছে উচ্চশিক্ষার অধিকারী। সে যে বর্ণেই জন্ম নিয়ে থাক না কেন সে ব্রাহ্মণই। আজ শিক্ষাক্ষেত্রে এমন লোকই নেই, এটাই হচ্ছে সমাজের দুর্গতির কারণ। স্বাভাবিক যে এমন লোক সমাজে কমই হবেন কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও তাঁদের থাকাটা হচ্ছে অনিবার্য। নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেওয়ার লোকেদের সঠিক অর্থে ব্রাহ্মণ হওয়া উচিত।

(১০) ব্রাহ্মণকে যুদ্ধ করবার দরকার নেই। যুদ্ধশাস্ত্র জানা দরকার। ব্যবসা করবার দরকার নেই। ব্যবসার শাস্ত্র জানার দরকার আছে। রাজ্যের শাস্ত্র জানা দরকার এবং যোদ্ধা, ব্যবসায়ী ও রাজার পথনির্দেশ করা দরকার। এরকম আবশ্যকতা অনুসারে নতুন ব্যবহারশাস্ত্র রচনার প্রয়োজন আছে। যুগানুসারে শাস্ত্রের নব নব অর্থ উদ্ধার করতে হবে। এমনটা করবার জন্য যে নিঃস্বার্থ বুদ্ধির দরকার তার শিক্ষা ব্রাহ্মণের জন্য আবশ্যক।

ক্ষত্রিয় বর্ণের শিক্ষা :

ক্ষত্রিয় বর্ণের শিক্ষার বিষয় হচ্ছে এইরকম :

(১) ক্ষত্রিয়দের সমাজকে রক্ষা করতে হবে। এই কথা ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত মানুষদের হৃদয়ে গাঁথা দরকার। এর শিক্ষা সর্বপ্রথম দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ক্ষত্রিয়দের গোব্রাহ্মণ প্রতিপালনের বিধান দেওয়া হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ কথাটির তাৎপর্য জ্ঞান ও সংস্কৃতির উপাসক। মোটকথা, সর্বপ্রকারের ভৌতিক সমৃদ্ধির স্রোত। এই দুটিকেই রক্ষা করা হচ্ছে ক্ষত্রিদের পরম কর্তব্য।

(২) মানসিকতা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধকলায় শিক্ষাও অত্যন্ত আবশ্যক। এমনিতে সকলেরই যুদ্ধকলা, পরাক্রম, সজ্জনদের রক্ষা দেশভক্তি ইত্যাদি শিক্ষা পাওয়া একান্ত উচিত, কিন্তু ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধকলার শিক্ষা বিশেষভাবে দেওয়া দরকার।

(৩) ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাধারণ ব্যবহার ইত্যাদি অনেক বিষয়ের শিক্ষা তাদের তো পাওয়াই উচিত।

(৪) রাজ্য শাসন কী করে করতে হয় তার শাস্ত্রও ক্ষত্রিয়দের শেখানো উচিত।

(৫) ক্ষত্রিয় বর্ণের শিক্ষা প্রাপ্ত করবার জন্য ব্যক্তির মধ্যে ক্ষত্রিয় বর্ণ থেকে কাঙ্ক্ষিত বল, বুদ্ধি, দুর্জনদের দণ্ড দেবার মতো বৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর পরীক্ষা দেওয়া উচিত। ভীরু, দুর্বল, স্বার্থপর নিজেকে রক্ষা করবার বৃত্তিধারী ব্যক্তি ক্ষত্রিয় হতে পারে না এবং তার ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষা প্রাপ্ত হতে পারে না।

(৬) কথা পালন করা, রণক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ না করা, কাউকে রক্ষা করবার সময়

নিজের কষ্টের চিন্তা না করা, ভিক্ষার জন্য কখনও হাত না পাতা, কেউ ভিক্ষা চাইলে কখনও বিমুখ না করা হচ্ছে ক্ষত্রিয়োচিত স্বভাব। এই স্বভাবের যাতে জাগরণ ও যত্ন হয়, এমন শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(৭) সমাজে এমন মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজন আছে এই কথার সবাই সহমত হবেন। এই আবশ্যকতা পূরণের জন্য কেবলমাত্র সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হওয়াই পর্যাপ্ত নয়। সার্বজনিক জীবনে এই গুণ প্রদর্শন চাই। সৈনিক হোক বা না হোক দুর্বলকে রক্ষা করা, ন্যায়ের পক্ষ নেওয়ার ও অন্যায়ের প্রতিকার করবার প্রবৃত্তি ক্ষত্রিয়দের থাকা দরকার।

বৈশ্য বর্ণের শিক্ষা :

বৈশ্য বর্ণের শিক্ষার লক্ষ্য এরকম :

(১) বৈশ্যগণ সমাজের ভরণপোষণ করে থাকে। ভগবান বিষ্ণু যিনি জগতের প্রতিপালক তিনিই হচ্ছেন তাঁদের আদর্শ। এইজন্য সমাজকে যেন কোনো প্রকারের অভাবে বেঁচে না থাকতে হয় তা দেখবার দায়িত্ব হচ্ছে বৈশ্য বর্ণের। বৈশ্য বর্ণকে কাজের কুশলতা শেখানোর পূর্বে এই মানসিকতা গড়ে তোলা শিক্ষার বিশেষ অঙ্গ হওয়া দরকার।

(২) কৃষি ও গোপালন হচ্ছে বৈশ্যের মূল ব্যবসা। এজন্য ভূমি ও গোরুর সঙ্গে সম্পর্ক খুব ছোটো বয়স থেকেই হওয়া দরকার। এই দুইই খুবই পরিশ্রমের কাজ। এজন্য ছোটো থেকে মাটি ও গোরুর সঙ্গে পরিশ্রম করতে আনন্দ অনুভব হয়— এমন শিক্ষাব্যবস্থা দরকার।

(৩) কৃষির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য হচ্ছে বৈশ্যবর্গেরই কাজ। এজন্য বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত শিক্ষার ব্যবস্থাও ছোটো বয়স থেকেই হওয়া উচিত।

(৪) দান করা, সম্পত্তির মালিক হওয়া, বৈভবের মধ্যে থাকা হচ্ছে বৈশ্যবর্ণের স্বভাব। বৈশ্যের হাত গ্রহণের জন্য নয়, বরং দানের জন্য এগিয়ে যায়।

(৫) দেশের আর্থিক সমস্যা কী, প্রাকৃতিক সম্পদের যত্ন কীভাবে নেওয়া দরকার যন্ত্রের ব্যবহার করতে কীরকম বিবেকপূর্ণ চিন্তাভাবনা দরকার, মানুষ যাতে রোজগার না হারায় ও কাজ করবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে এই দৃষ্টিতে কী ব্যবস্থা করা উচিত তার বিচার এবং পরিকল্পনাও হচ্ছে বৈশ্যেরই কাজ।

(৬) বাণিজ্যের জন্য দেশে বিদেশে যাওয়া, বিদেশে বাণিজ্য এমন ভাবে করতে হবে যাতে আমাদের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এবং মূল্যবান সামগ্রী প্রাপ্তি হয় কিন্তু আমাদের অর্থ বিদেশে চলে না যায় এবং আমরা গরিবে পরিণত না হই।

(৭) সমৃদ্ধি অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্র যেন ধর্মবিহীন না হয়ে ওঠে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণ মানুষের স্বাস্থ্য ও সংস্কারের ক্ষতি যেন না হয়। এভাবে বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করাও বৈশ্যকে শেখানো উচিত।

শূদ্র বর্ণের শিক্ষা :

শূদ্র বর্ণের শিক্ষার বিশিষ্ট অঙ্গ এরকম :

(১) শূদ্র বর্ণের সঙ্গে নির্মাণ এবং পরিচ্ছন্নতার সমস্ত কাজ জুড়ে আছে। জনসাধারণের আরোগ্য এবং অসংখ্য বস্তুর সুবিধা দেওয়ার দায়িত্ব শূদ্রের ওপর রয়েছে। উদাহরণের জন্য বিভিন্ন প্রকারের পাত্রের প্রস্তুতি কৃষির জন্য আবশ্যক যন্ত্র প্রস্তুত, বস্ত্র, ভবন, বাহন ইত্যাদি নির্মাণ করা হচ্ছে শূদ্রের কাজ। এটা স্বাভাবিকই যে সমাজের সমৃদ্ধির মূল আধার প্রথমত শূদ্রের ওপর এবং দ্বিতীয়ত বৈশ্যের ওপর হয়েছে। শূদ্রগণ নির্মিত বস্তুসমূহের বাজারের ব্যবস্থা বৈশ্যবর্গ করে থাকেন।

(২) সমস্ত সমাজের সর্বপ্রকার সুবিধা প্রাপ্ত হোক ও কষ্ট দূর হোক এটা দেখার দায়িত্ব হচ্ছে শূদ্রদের। এই দায়িত্ববোধ শেখাবার শিক্ষা শূদ্রদের দেওয়া উচিত।

(৩) আজকের ভাষায় বললে তো সর্বপ্রকারের ইঞ্জিনিয়ারিং, সর্বপ্রকারের কারখানা, সড়ক, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ পরিকল্পনা শূদ্রের আওতাতেই যাবে। এসব কাজের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষা সংস্থাও শূদ্রের অধিকারেই থাকবে।

(৪) শূদ্রদের সঙ্গে বিগত দুশো বছরে অনেক অত্যাচার হয়েছে। সমাজে ব্রাহ্মণ আদি তিন বর্ণের মানুষদের সঙ্গে অপরাধ স্বরূপ শূদ্রদের মধ্যে একদিকে হীনতাবোধ, অন্যদিকে বিদ্রোহ তথা অন্যবর্ণের প্রতি দ্বেষ ও তিরস্কারের ভাবনা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এতে তাদের কোনো দোষ নেই। বিদ্রোহের ভাবনা জাগাটা হচ্ছে স্বাভাবিক। কিন্তু এতে সামাজিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। সমাজের স্বাস্থ্য ভালো হোক এই দৃষ্টিতে সব বর্ণেরই জন্য উচিত শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

(৬) নির্মাণের ক্ষেত্র হচ্ছে কারিগরির ক্ষেত্র। কারিগরির ক্ষেত্রে সব বস্তুর মধ্যে উৎকৃষ্টতা শূদ্রের কাজের লক্ষ্য। অতীতে অনেক বস্তুতে উৎকৃষ্টতার শ্রেষ্ঠতম নমুনা আমরা বিশ্বকে দিয়েছি। এই কথা শূদ্রদের মনে করানো আমাদের উচিত। এমন কারিগরির প্রেরণা দেওয়া উচিত।

সাধারণ কিছু কথা :

(১) এতক্ষণ আমরা চারটি বর্ণের আদর্শ শিক্ষার আলোচনা করেছি। তথাপি এমন কিছু কথা আছে যা চারটি বর্ণের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ বাচন ও লেখন, সাধারণ হিসেব, সাধারণ শিষ্টাচার দেশ বিদেশের জ্ঞান সকল বর্ণের শিক্ষার অংশ হওয়া উচিত।

(২) সদগুণ ও শিষ্টাচারের শিক্ষা সকল বর্ণের জন্য আবশ্যক হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত জীবনের শুদ্ধতা ও পবিত্রতা, সার্বজনিক জীবনের নীতিপরায়ণতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ, দেশভক্তি, ধর্মনিষ্ঠা, ধর্ম ও সংস্কৃতির জ্ঞান ইত্যাদি কথা সকল বর্ণের জন্যই আবশ্যক।

(৩) এমনটা মনে হতে পারে যে, আজ মাধ্যমিকস্তর পর্যন্ত শিক্ষা সকল বর্ণের জন্য সমানই আছে। ওটা এই স্বরূপের হতে পারে। কিন্তু কল্যাণকর এটা হতে পারে যে চারটি বর্ণের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা হোক এবং এই শিক্ষা সমরসতার সঙ্গে দেওয়া হোক। এমনটা হলে নিজ বর্ণের শিক্ষা ছোটো বয়স থেকেই পাওয়া যাবে। ব্যক্তির সমুচিত বিকাশের জন্য এটা হচ্ছে আবশ্যিক।

(৪) যেসব বর্ণের সঙ্গে আচার তথা ব্যবসা জুড়ে আছে ওই ব্যবসার শিক্ষাও যুক্ত হওয়া উচিত। ওই শিক্ষার ব্যবস্থা শিশু অবস্থা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত ওই ব্যবসার অঙ্গ হওয়া উচিত। অনুসন্ধান ও তার অঙ্গ উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত এর কেন্দ্র একই স্থানেই হবে। এই অর্থে চারটি বর্ণের মানুষ সমান ভাবে উচ্চশিক্ষিত হতে পারবে, নিজ বিষয়ের অধ্যয়ন করতে পারবে এবং নিজের বিষয়ে অনুসন্ধানও করতে পারবে।

(৫) যদি আমরা জন্ম থেকে বর্ণ চাই, তবে তাতে বেশি সমস্যা নেই। কিন্তু আমরা যদি জন্ম থেকে বর্ণ না চাই নিজের বর্ণ স্বয়ং নিশ্চিত করতে চাই তবে সেই কাজ বিধিবদ্ধ শিক্ষা শুরুর পূর্বে করা উচিত যাতে করে শুরু থেকেই নিজ বর্ণানুসারে শিক্ষা মেলে। লক্ষ্য এটা রাখা উচিত যে আমরা একসঙ্গে দুটি বর্ণে যেন না থাকি। জন্ম থেকে যদি আমরা ব্রাহ্মণ হই এবং আমরা যদি বৈশ্য কিংবা শূদ্রের কাজ করি তখন আমরা দুই বর্ণেরই লাভ নিতে চাইব এবং দুটোর বন্ধন থেকেই মুক্ত থাকতে চাইব— আজকাল এমনটাই হচ্ছে— এই জন্যই কথাটা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

(ক্রমশ)

ভাষান্তর : সূর্য প্রকাশ গুপ্ত
প্রাক্তন অধ্যাপক

উর্বর কৃষিজমি নষ্ট করে নীলসাদা কিষান মান্ডি

ড. মানবেন্দ্র রায়

দেশের অন্যান্য রাজ্যের দেখাদেখি আমাদের রাজ্যের কৃষকদের ফসল বিক্রির সুবিধার জন্য প্রায় ১৭৭টি নীল সাদা রঙের কিষান মান্ডি তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি মান্ডি পিছু খরচ প্রায় ৫ কোটি টাকা। মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের আর কে ভি ওয়াই প্রকল্পের অ্যাসেট বিল্ডিংয়ের টাকা ব্যবহার করে এগুলো গড়ে তোলা হয়। এবার প্রশ্ন,এই মান্ডিগুলির জন্য প্রয়োজনীয় এত জমি কোথা থেকে পাওয়া গেল? এই মান্ডিগুলি কি কোনো অব্যবহৃত, অকৃষি জমির উপর গড়ে উঠেছে? না একেবারেই না। এগুলো মূলত সরকারি কৃষি খামারের নিশ্চিত সেচ যুক্ত দ্বিফসলি/তিন ফসলি জমির উপর গড়ে উঠেছে। অথচ তৃণমূল কংগ্রেসের ২০১১ সালের নির্বাচনী ইস্তেহারে সরকারি কৃষি খামারগুলির উন্নতিসাধন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করার কথা বলা ছিল। সেটাই তো করা উচিত ছিল। মমতা ব্যানার্জির কাছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তো সে আশাই করেছিল। কৃষি জমি রক্ষার আন্দোলন করেই মমত ব্যানার্জি ২০১১ সালে সরকারে এসেছিলেন। নন্দীগ্রামে কৃষি জমি নষ্ট হবে এই অজুহাতে শিল্প হতে দেননি, সিঙ্গুরে প্রায় তৈরি হয়ে যাওয়া টাটা কোম্পানির গাড়ি কারখানা চালু হতে দিলেন না। সিঙ্গুরের সেই জমিতে না হলো কোনো কারখানা, না করা গেল চাষবাস। শুধুমাত্র মমতা ব্যানার্জির জেদের জন্য কৃষক পরিবারের বেকার যুবকরা চাকরি থেকে বঞ্চিত হলো। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের অন্যতম সমস্যা হলো সঠিক সময়ে গুণমান সম্পন্ন বীজ না পাওয়া।

আজ পশ্চিমবঙ্গের চাষিরা চাষ করে বাইরের রাজ্যের বীজের ভরসায়। আলু বীজ আনতে হয় পঞ্জাব থেকে। সবজি বীজের জন্য তাকিয়ে থাকতে হয় মহারাষ্ট্রের মতো

রাজ্যগুলির দিকে। অথচ কৃষি খামারের সোনার জমি এবং এ রাজ্যের সুদক্ষ কৃষি আধিকারিক ও বিজ্ঞানীদের কাজে লাগিয়ে অনায়াসে এই সমস্ত বীজ উৎপাদন করে রাজ্যকে স্বয়ম্ভর করা যেত। শুধু কী বীজ উৎপাদন, বিভিন্ন ফুল-ফলের নার্সারি তৈরি করে কৃষকদের স্বল্প মূল্যে চারা সরবরাহ করার ব্যাপক সুযোগ ছিল। কৃষি খামারের পুকুরে উন্নত মানের মাছের চারা তৈরি করা যেত। এই খামারগুলিতে অসংখ্য বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ ছিল। না সেটা হলো না। তা না করে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা খরচ করে রাজ্যের কৃষি খামারগুলির উর্বর কৃষি জমি নষ্ট করে এবং সমস্ত রকম নিয়োগ বন্ধ রেখে সেখানে নীল সাদা রঙের কিষান মান্ডি তৈরি করা হলো। বেশিরভাগ কিষান মান্ডিগুলি মূল বাজার থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, সেখানে যাতায়াতের ব্যবস্থা ভীষণ খারাপ, পরিকাঠামো অত্যন্ত শোচনীয়।

ফলত কৃষকেরা এখানে যেতে চান না। বেশিরভাগ কিষান মান্ডিতে বর্তমানে কিছু সরকারি অফিস ভাড়া দেওয়া হয়েছে। অনেক মান্ডি আজ ভুতুড়ে বাড়ি হয়ে পড়ে আছে এবং অসামাজিক কাজের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এই মান্ডিগুলি রাজ্যের কৃষকদের কোনো কাজে না এলেও শাসকদল ঘনিষ্ঠ কন্ট্রাক্টররা এখান থেকে প্রচুর টাকা কামিয়ে নিলেন। অভিযোগ, এর ভেট অনেক শাসকদলের নেতা ও শাসকদল ঘনিষ্ঠ আমলারাও পেলেন। কৃষি- খামারগুলির উর্বর কৃষিজমি শুধুমাত্র কিষান মান্ডি করেই নষ্ট করা হয়নি সেখানে বিভিন্ন জায়গায় আইটিআই কলেজ, কর্মতীর্থ প্রভৃতি নাম দিয়ে কিছু বিল্ডিং সম্পূর্ণ পরিকল্পনাহীন ভাবে যত্রতত্র নির্মাণ করে কৃষি খামারগুলির সর্বনাশ করা হয়েছে। রাজ্য কৃষি খামারের জমি নষ্ট না করে কি অন্য উপায় কি ছিল না? অবশ্যই ছিল। দরকার ছিল বর্তমানে চালু হাটগুলির সংস্কার এবং আধুনিকীকরণ। কেন্দ্র সরকারের টাকা খরচ করে কিষান মান্ডি গড়লেও এ রাজ্যের কৃষকের এখনও ভরসা সেই পুরানো হাট। এই হাটগুলিতে এসে কৃষকরা যাতে ন্যায্য মূল্য এবং ওজনে বঞ্চিত না হয় তার জন্য রাখা দরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা।

আজকের এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে একটু আধটু সরকারি সদিচ্ছা দেখালেই পণ্য বিক্রি করতে আসা কৃষকদের ভারতের বিভিন্ন বাজারের ফসলের দাম সম্বন্ধে অবহিত করা সম্ভব। এতে করে কৃষকরা সঠিক মূল্যে পণ্য বিক্রি করে বাড়ি ফিরতে পারবে। দূরদূরান্ত থেকে আসা কৃষকদের জন্য এসব বাজারে শৌচাগার, এটিএম থাকা অত্যন্ত জরুরি। যে বিষয়টির অভাবে চাষিরা বাজারে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটি হলো অবিক্রিত পণ্য মজুত রাখার জন্য গুদামের অভাব। সরকারি উদ্যোগে এই হাটগুলিতে যদি আধুনিক মানের ফসল মজুতের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে চাষিদের আর কমদামে বাধ্য হয়ে ফসল বিক্রি (ডিস্ট্রেসড সেল) করতে হবে না।

সামগ্রিক ভাবে বলা যেতে পারে সরকারি কৃষি খামারের উর্বর কৃষি জমিগুলি কৃষক মান্ডির জন্য নষ্ট হলো কিন্তু কৃষক কোনও লাভ পেল না। □

ইমরানের মুখোশ খুলে দিলেন বঙ্গললনা

শুক্লা শিকদার॥ ২০১৯ সালে তিনি দেবীপক্ষের শুরুতেই বাক্যবাণে ঝরিয়েছিলেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। নিউইয়র্কের মাটিতে পাক রাষ্ট্রপ্রধানের জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, পাকিস্তানই একমাত্র দেশ যারা রাষ্ট্রপুঞ্জের কালো তালিকায় থাকা এক জঙ্গিকে পেনশন দেয়। ৯/১১ হামলার মাথা ওসামা বিন লাদেনকে নিজের দেশে লুকিয়ে রাখে। প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'কেউ একজন যিনি এক সময় ক্রিকেট খেলতেন, জেন্টলম্যানস গেমে বিশ্বাস রাখতেন, তিনি এখন হিংসা ও বন্দুকের খেলায় ভরসা রাখছেন। অস্বীকার করতে পারেন মিস্টার প্রাইমমিনিস্টার?'

দেশ ভাগের পর পাকিস্তানে অমুসলমান জনসংখ্যা যে ২৩ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশে নেমে এসেছে সেটাও উল্লেখ করে পাক প্রশাসনকে কাটগড়ায় দাঁড় করাতেও ভোলেননি তিনি। তার বাচনশৈলীর পংক্তিতে পংক্তিতে তিনি বিদ্ধ করেছেন পাক প্রশাসনকে। চরম কূটনীতিক আক্রমণ করেছেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান 'Khan's veiled threat of nuclear devastation was an example of 'brindmanship' and not 'statesmanship'।

পাক প্রধানমন্ত্রীকে তিনি সম্বোধন করেছেন ইমরান খান নিয়াজি বলে। মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি নিয়াজি বংশের মানুষ। এই নিয়াজিই একাত্তরের বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান তথা বাংলাদেশের মানুষের ওপর ঘৃণ্য অত্যাচারের নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই নিয়াজি বংশ নিয়েই পাকিস্তানে একসময় আগুন জ্বলেছে এবং এখনও জ্বলছে। নিয়াজিদেরই দেশছাড়া করার ডাক উঠেছে খোদ পাকিস্তানের মধ্যে থেকেই।

১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারতীয় সেনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন আমির আবদুল্লাহখান নিয়াজি। তিনি ছিলেন তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের শেষ গভর্নর এবং পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক হাইকমান্ডের সর্বশেষ কমান্ডার। তিনিও যে একজন নিয়াজি বংশের, সেকথাও ইমরান খানকে মনে করিয়ে দিয়েছেন এই ভারত-ললনা। সবশেষ বলেছেন ভারতের দিকে আঙুল তোলার আগে দয়া করে নিজেদের ইতিহাসটাকে একটু ঝালিয়ে নিন মিস্টার ইমরান খান নিয়াজি!

কে বলেছে অসুর বধ করতে দশটি হাত লাগে? কণ্ঠের দৃপ্ততায়, শিক্ষাগত যোগ্যতায় ও বুদ্ধিমত্তায় তার জোর দশ হাতের দেবীদুর্গার থেকে কিছুকম বলে মনে হয় না। ভারতীয় সৈন্য দেশের সীমান্তে প্রতিরোধ গড়ে তুললেও তিনি ভারতমাতার পক্ষ থেকে গড়ে তুলেছেন কূটনৈতিক বুদ্ধিদীপ্ত ক্ষিপ্র বাচনশৈলীর প্রতিরোধ। যে প্রতিরোধ রাষ্ট্রপুঞ্জে তাঁর দেশমাতাকে গৌরবান্বিত করেছে। সেদিন বাস্তবিকই তার কণ্ঠে অগণিত ভারতবাসীর কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

সেই ভারত-কন্যা আরও একবার দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন দুর্গাপূজার মধ্যেই। রাষ্ট্রসঙ্ঘের গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টাকমিটিতে এশীয় প্যাসিফিক দেশগুলোর একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হলেন তিনি। এক্ষেত্রে প্রতিনিধি নির্বাচনে তিনি তার নিকটতম ইরাকি প্রতিদ্বন্দ্বীকে ১২৬:৬৪ ভোটে পরাজিত করে ছিনিয়ে নেন বিজয়ীর মুকুট। বিজেতার নির্ণায়ক মাপকাঠি ছিল শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা। আর তাতেই তিনি বাজিমাত করেন, এশিয়া প্যাসিফিকের প্রতিনিধি হিসেবে জায়গা করে নেন সকলের মনের মণিকোঠায়। তবে কথায় আছে ওস্তাদের মার শেষরাতে, আর সেটাই প্রাকারান্তরে করে দেখিয়েছেন এই বাঙ্গালি বংশোদ্ভূত ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস (আইএফএস) অফিসার। চিনতে পারলেন? তিনি কে? তিনি ২০০৯ সালে রাষ্ট্রদূত বিমল সান্যাল স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে ২০০৮ সালের ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস অফিসার। তিনি ভারতমাতার অগ্নিকন্যা, বঙ্গললনা বিদিশা মৈত্র। ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস (আইএফএস) অফিসার, পলিসিপ্ল্যানিং এবং রিসার্চ বিভাগের সহকারী সচিব। সর্বোপরি তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিযুক্ত ভারতের মিনিস্ট্রি অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স-এর ফার্স্ট সেক্রেটারি। ■

ইমরান খান ও বিদিশা মৈত্র

শব্দরূপ-৪ (বিষয় অভিমুখ—প্রাচীন ভারত) **অরুণ কুমার ঘোড়ই**

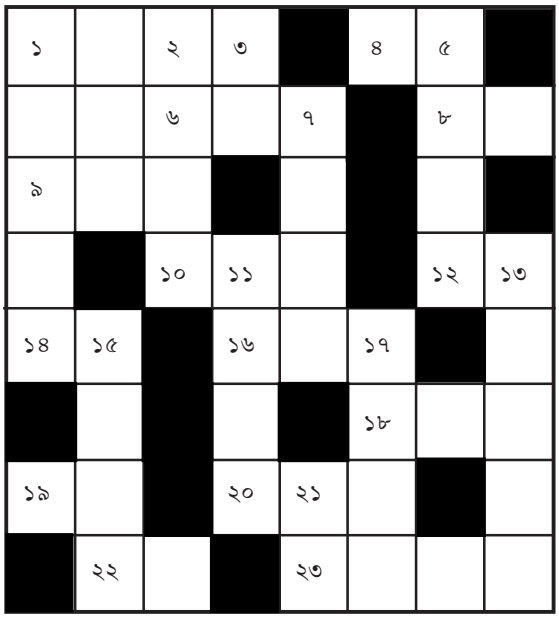

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. এর অববাহিকায় সিন্ধু সভ্যতা,
৪. ইনিই বুঝি চন্দ্রগুপ্তের মাতা!
৬. আরবি ভাষায় 'শপথ'-এ।
৮. বার্ধক্য—যা আসে সব দেহে।
৯. মহেঞ্জোদড়োর মতো আরও এক স্থান,
১০. চাইলে 'আসল', তার উল্টোটি পান।
১২. 'তাহা হইলে'—উত্তরখানি,
১৪. 'রজ্জু' ধরে টানাটানি।
১৬. 'নয় ধারায় বিভক্ত'—কী বুঝলেন?
১৮. কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক—'সেন'।
১৯. বৌদ্ধগ্রন্থ—যে ভাষাতে,
২০. মুহূর্তকাল—বোঝায় এতে।
২২. 'জন্মদাতা'—প্রণাম তাঁকে!
২৩. 'হর্ষচরিত'—এর রচয়িতা কে?

উপর-নীচ : ১. সিংহ মূর্তি খচিত দরজা,
২. শক দস্যুদের এক দাপুটে রাজা।
৩. সমূহ...সম্প্রদায়— বোঝায় এটি,
৫. মেবারের বীর ক্ষত্রিয় জাতি।
৭. একদা কাঞ্চীর রাজবংশ এ,
১১. তীর্থস্থানটি রয়েছে জেনো,
১৩. নবরত্নের একজন জেনো,
১৫. পাথরে খোদিত লিপি খুঁজে এনো।
১৭. 'দৌড়ে যাচ্ছে'—শব্দটি কী?
২১. ইনিই কি ইভ...আদি মানবী?

(● আগামী সংখ্যায় সঠিক উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশ করা হবে।)

প্রেরণার পাথেয়

'অহিংসা পরমো ধর্ম' এই তত্ত্ব হিন্দু সমাজের সকলেই জানে। অতএব সকলকে অহিংসা শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বও হিন্দুদের। কিন্তু যদি আমরা অপরকে আমাদের উপদেশ শুনাইতে চাই তাহা হইলে আমাদের নিজেদের প্রথমে প্রয়োজনমতো শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। হিংসাবৃত্তি দুর্বল সমাজকে মোটেই গ্রাহ্য করে না। অথচ আজ হিন্দু সমাজ দুর্বল। যদি আমরা অহিংসা মন্ত্রের বড়ি হিংসাপরায়ণ লোকেদেরও গলা দিয়া নামাইতে চাই তবে প্রথমে আমাদের শক্তিশালী হইতে হইবে যাহাতে তাহাদের উপর আমাদের উপদেশের সুপরিণাম হয়। যদি হিন্দুস্থানে আমরা অহিংসার সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে চাই তবে হিন্দু সমাজের দুর্বলতা নষ্ট করিয়া ইহাকে শক্তিশালী করা নিতান্ত আবশ্যক।

* * *

আমরা সঙ্ঘের এক একটি অঙ্গ স্বরূপ। অর্থাৎ সঙ্ঘ পূর্ণরূপে আমাদের। শরীরের সহিত অঙ্গের যে সম্বন্ধ, সঙ্ঘের সহিত আমাদের সেই একই সম্বন্ধ। শরীরের সমস্ত অবয়বের বিকাশ যদি একভাবে এবং একই সময়ে হয় তবেই শরীর সমর্থ্য ও সুদৃঢ় হইতে পারে। মনে কর তুমি একরকম ব্যায়াম শুরু করিলে যাহাতে শুধু বুক ও হাত সুদৃঢ় হয়, কিন্তু পায়ের কোনো ব্যায়াম হয় না, তাহা হইলে দেখিবে যে পা ময়ূরের মতো কৃশ হইয়া গিয়াছে এবং শরীরের সহিত খাপ খাইতেছে না! কেবল তাহাই নহে প্রয়োজনের সময়ে এই পা তোমাকে সহায়তাও করিতে পারিবে না। প্রয়োজনের সময়ে তোমাকে বিপদে পড়িতে হইবে। পঁচিশ ত্রিশ মাইল পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হইলে পা টলিতে থাকিবে। পাহাড়ে চড়িতে গেলে পা কাঁপিবে এবং হাত যে মহান কাজ করিতে উদ্যত হইবে পা তাহাতেই বাদ সাধিবে। আমরা যদি সঙ্ঘের অঙ্গস্বরূপ হই তবে আমাদের সকলের একই সঙ্গে একই রূপ উন্নতি হওয়া উচিত নয় কি? আর এইজন্য সকলেরই কি সঙ্ঘের কার্যক্রমে নিয়মিত ভাবে অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়?

* * *

একবার আমাদের মনের মধ্যে এই ভাব উৎপন্ন হোক যে আমাদের দেশকে বিপন্নাবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান যে সমস্ত লোককে পাঠাইয়াছেন তাহার মধ্যে আমিও একজন। এইরূপ আত্মানুভূতি হইলে স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের দায়িত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের কার্য্য সম্পাদন করিতে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রাণপণে প্রয়াস করিতে পারিব। নিম্নলিখিত বাক্য তখন আমাদের ধ্যেয় বাক্য হইবে—

নঁহী নরদেহী কা ভরোসা,
কব আয়ুষ ঘট হোবে রীতা?
আওয়ে প্রসঙ্গ ক্যায়সা কোন্ জানে?
ইসলিয়ে রহনা সাবধান!
যথাশক্তি করতে জানা কাম
স্বদেশ ভক্তি সে ভর দেনা—'ভূমণ্ডল।'

('ডাক্তারজীর বাণী' পুস্তিকা থেকে গৃহীত)